আমাদের
ইন্তিফাদা
মুহাম্মদ আতীক উল্লাহ

আমাদের ইন্তিফাদা

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

প্রকাশনা
দারুল ইলম

উৎসর্গ

নাম জানা-অজানা অসংখ্য ভাইদেরকে
যারা জান্নাতে বিচরণ করছেন।
নাম জানা-আজানা অসংখ্য ভাইদেরকে
যারা তামান্নায়ে (−) বুকে লালন করেছিলেন সেদিন।
রাব্বে কারীম সবার মেহনতকে কবুল করে নিন
আমীন।

শুরুর কথা

এটা একান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ আখ্যান। আমি শুধু আমার সম্পৃক্তির বিষয়গুলো বয়ান করে গিয়েছি। এর বাইরে যে ঘটনার বিপুল ব্যাপ্তি তা অধরাই থেকে গিয়েছে। সেটা অভিজ্ঞজনদের জন্যই তোলা রইল।

এই লেখায়, আমরা ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারিনি। যখন যেটা মনে এসেছে, লিখে গিয়েছি। দ্বিতীয়বার নজর বুলাতে গিয়েও নতুন কিছু মনে এলে লিখে দিয়েছি। সব মিলিয়ে লেখাটা অনেক জায়গায় অগোছালো রয়ে গেছে। সেজন্য দুঃখিত। তবে পুরো লেখাটা একটা সফরনামাকে ঘিরে। আবার বর্তমানের কিছু কথাও তখনকার 'তাজাদম' সময়ের ঘটনার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এ বিষয়টা মনে রেখে পড়লে খটকা লাগবে না।

আমাদের এই অভিজ্ঞতার কথনকে একটা সূচির মতো দেখার অনুরোধ রইল। প্রায় সব মাদরাসাই এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। আর কিছু মাদরাসা তো আরো হাজারগুণ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। কিছু মাদরাসায় তালাও ঝুলেছিল।

৫ মে আমাদের আমাদের কারবালা। আমাদের ইন্তিফাদা। ৫ মে দিবাগত রাত আমাদের জন্য বিরাট এক 'নাকাবা'। আমাদের নাকাসা। আমাদের সাওরাহ। আমাদের মানযিকাটার। আমাদের পলাশি। আমাদের শামেলি। আমাদের বালাকোট। আমাদের মহিশূর। আমাদের ১৮৫৭।

যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততদিন এই রক্তাক্ত স্মৃতি মুছে যাবে না। মোছার নয়। বাংলাদেশ ও বিশ্ব মুসলিম ইতিহাসে এই দিন অমলিন হয়ে থাকবে। আমরা শুধু কুরআনের ভালোবাসায় সেদিন একত্র হয়েছিলাম। আমরা সেদিন শুধু নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশকে সেদিন ছুটে এসেছিলাম।

এ পুস্তিকা মোটেও সামগ্রিক চিত্রের রূপায়ন নয়। এটাকে একটা খন্ড চিত্র বলা যেতে পারে। আরও অনেক কথা রয়ে গেছে। পরের সংস্করণে সেগুলো যোগ করার নিয়ত রইল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবার মেহনতকে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

কিশিহ্লাহির রাহমানির রাহীম

যেতে যেতে যেতে : ১

মের পাঁচ তারিখ। শাহাদাতের রক্তে লাল একটি দিন। তারও কয়েকদিন পর। সেই লালরাতের কয়েক রাত পরে, ভোর তিনটায় আমরা রওয়ানা দিলাম কুমিল্লার এক গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। এক জানবাজ মুজাহিদের দেশে। এক বীর শহীদের বাড়িতে। পাঁচ তারিখে শাহাদাতের অমিয় সুধা পানকারী এক পূর্ণ মর্দে মুমিনের পর্ণ কুটিরে। ছয়টি ছোট ছোট ইয়াতীম শিশুর কান্নার দেশে। জীবনসাথি হারিয়ে নির্বাক হয়ে যাওয়া এক বিধবার ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাওয়া সংসারে। সারাক্ষণ চোখের পানি মোছা অসহায়, কপর্দকহীন কওমি শিক্ষক, এক বয়োবৃদ্ধ আলিম শ্বশুরের ভিটায়।

যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল কয়েকদিন আগে থেকেই। এ কয়দিন– পাঁচ তারিখের পরের কয়েকটা দিন– পঙ্গু হাসপাতালে, শিশু হাসপাতালে, সোহরওয়ার্দি হাসপাতালে, চক্ষু হাসপাতালে নিদ্রাহীনভাবে চরকির ঘুরপাক খেতে হয়েছে।

সৌভাগ্যের সূচনা

পাঁচ তারিখে আহত গাজি সাহেবগণের এবং শাহাদাতি 'শরাবান তহুরার' পেয়ালা পানকারীগণের খিদমতের সূচনা এভাবেই হয়েছিলঃ

একদিন কামরায় বসে আছি। কিতাব মুতালা'আ করছি। দরসের প্রস্তুতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। দম ফেলার ফুরসত নেই। কোনো দিকে তাকাবারও সুযোগ নেই। এমন সময় মাওলানা রজীবুল হক সাহেব এলেন। একজন আপাদশির ভালো মানুষ। তিনি ঢালকানগর হযরতের মুজায (খলীফা)।

তিনি এক বিরল গুণের অধিকারী। আমাদের ঘরানায় গুণটা বিরল না হলেও, এই গুণকে কাজে পরিণত করার সদিচ্ছাটা বিরল বলতেই হবে। গুণটা হলো– মানবসেবা। তিনি সারাক্ষণই অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। মানবসেবাটা তাঁর একটা ব্রত। তাঁর একটা মিশন। তাঁর একটা স্বপ্ন। মানবসেবা তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

পাঁচ তারিখের পর –সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া– সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। পুরো বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলো এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি। অপ্রত্যাশিত এক বৈরিতার সম্মুখীন। দ্বীনের এই দুর্গগুলো ছিলো অস্তিত্ব-সংকটের দ্বারপ্রান্তে। কেমন যেন এক গুমোট আবহাওয়া মাদরাসাগুলোতে ছেয়ে ছিলো। সবাই নির্বাক, বিমূঢ়। সবার মনে একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে:

এ কি হলো ! এটা কেমন হলো ! এমনটা কেনো হলো? এমনটা তো-হওয়ার কথা নয়।

এমন অনিশ্চিত সময়েও মাওলানা রজিবুল হক সাহেব কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন আহত তালিবে ইলমদের সেবায়। চব্বিশ ঘন্টা, অহর্নিশি লেগে থাকলেন, শহীদানের লাশ গ্রামের গন্তব্যে পৌছে দেয়ার কাজে। তাঁর সামান্য যা পুঁজি ছিল তা সম্বল করেই নেমে পড়লেন। তিনি সেদিন এলেন আমাদের মাদরাসায়। তিনি প্রায়ই আসেন। তিনি আমাদের মাদরাসার অত্যন্ত আপনজন। এসে বললেনঃ

– পঙ্গুতে একজন তালিবে ইলম চিকিৎসাধীন আছে। তার জন্য কি খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে?

– অবশ্যই যাবে। কেন? ছেলেটির কী হয়েছে?

– ছেলেটির একটি পা কেটে ফেলা হয়েছে। গুলি লেগেছিল। কর্তব্যরত ডাক্তারদের অবহেলাতেই পা-টা কেটে ফেলতে হয়েছে। ছেলেটি আহত হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল, নড়াচড়ার শক্তি ছিলো না। বুলেটবৃষ্টি থেকে বাঁচতে, দেয়াল টপকাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে, পা-টার আরো বেশি ক্ষতি হয়েছিল। কোনো এক আল্লাহর বান্দা দয়া করে পঙ্গু পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। ছেলেটি ছোট। মীজান পড়ে। কর্তব্যরত ডাক্তার তো প্রথমে চিকিৎসাই করতে চায়নি। এক অমানুষ ডাক্তার ছেলেটাকে প্রথমে দেখেই বলল:

এই মোল্লা! এখানে কেন? তোদের হেফাজতের এখানে জায়গা নেই। আল্লাহকে বল, তোদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

ছেলেটার পা না কাটলেও হতো। কিন্তু ডাক্তার অপারেশনে না গিয়ে, একপ্রকার জোর করেই পা-টা একদম গোড়া থেকেই কেটে ফেলেছে। এখানেই শেষ নয়, এক ডাক্তার অসহায় ছেলেটার পা ড্রেসিং করতে এসে পায়ের কাটা স্থানে কেঁচির খোঁচা দিয়ে, প্রায়ই বলতো:

– কেন গিয়েছিলি? আর যাবি হেফাজতে?

আমরা কোন সমাজে বাস করছি? মানুষের মধ্যে কি ন্যূনতম মানবতাও নেই। ছোট্ট একটা ছেলে, সহজ-সরল। জীবনে কখনো শহরেও আসে নি। এই প্রথম শহরে এসেছে। হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুহাব্বতে ছুটে এসেছিলো। পেয়ারা নবীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যে এসেছে, তার সাথে কি এমন আচরণ করা সাজে?

আমি হুযুরকে বললাম:

– আমিও আজ আপনার সাথে যাবো। ছেলেটিকে দেখে আসবো। এমন মানুষকে দেখতে যাওয়া সাওয়াবের কাজ তো বটেই, প্রেরণারও। প্রিয় নবীজির প্রতি আমার ভালোবাসায় ঘাটতি থাকতে পারে, ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু এই মা'সুম তালিবে ইলমের 'ইশকে নবীতে' কোনো রকমের খাদ থাকতে পারে না।

– ঠিক আছে, চলুন।

হুযুর বললেন:

– আমরা দুদিন পর কুমিল্লা যাবো। এক শহীদ পরিবারের হাল-পুরছির জন্য। আপনি যাবেন?

– অবশ্যই যাবো। চলুন, এখন রওয়ানা দেয়া যাক।

একরাশ কান্না

হাসপাতালের কারগুজারি অনেক লম্বা। সেই পাঁচ তারিখ থেকে যে হাসপাতালের খেদমত শুরু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আজো সেই খেদমত জারি আছে। আমাদের মাদরাসা খুবই গরীব, আর্থিক শোচনীয়। তারপরও রাব্বুল আলামীন জানেন, আমরা আমাদের সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি। অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে, পরোয়া করিনি। আল্লাহর এই বান্দাগুলো নিজেদের জান কুরবান করতে প্রস্তুত হয়েছে, আর আমরা এটুকুও করতে পারব না? এই অসহায়, গরীব, গ্রামের সরলমনা তালিবে ইলমদের করুণ অবস্থা দেখলে যে কেউই বে-চাইন হয়ে উঠবে। উতলা হয়ে তাদের জন্য কিছু করতে দিল বে-কারার হয়ে যাবে।

আমি আর রজীব সাহেব হুজুর কথা বলতে বলতে পঙ্গুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। হুজুর কখনো অন্যদের গীবত করেন না। এই যে অসংখ্য তালিবে ইলম, আসাতিজায়ে কেরাম, অগণিত আশেকে রাসূল আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছেন, ছটফট করছেন, উল্লেখযোগ্য কেউ তখনো পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। এ নিয়ে তিনি কারো প্রতি কোনো অভিযোগ করছেন না। খেদ প্রকাশ করছেন না। অন্যদের দিকে তাকিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসেও থাকছেন না। আপন মনে কাজ করে যাচ্ছেন। মুরুব্বীদের প্রতিও তাঁর কোনো রকমের অনুযোগ দেখলাম না। পরিস্থিতি শান্ত হলে অনেকেই অবশ্য, ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এসেছেন।

পঙ্গুতে প্রবেশ করার আগে হুজুর আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন:

– প্রতিটি হাসপাতালে পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। হাসপাতাল থেকে অনেককে আহত অবস্থাতেই ধরে নিয়ে গেছে। আপনি সমস্যা মনে করলে হাসপাতালের মূল ফটকের বাইরে অপেক্ষা করুন। আমি ছেলেটাকে দেখে আসি।

হুজুর আরো বললেন:

– আমার কাছে ফায়ার সার্ভিসের একটা পাস আছে। আমি একবার তাদের ট্রেনিং কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম। তখন এই পাসটা আমি পেয়েছিলাম। পাসটা এই ঘোরতর দুর্দিনে অনেক কাজে লাগছে। এটা দেখালে পুলিশ-সিআইডির লোকেরা কিছু বলেনা।

আমি বললাম:

– আল্লাহ তা'আলা তাকদীরে যা রেখেছেন তাই- হবে।

রাব্বে কারীমের ওপর তাওয়াক্কুল করে সামনে পা বাড়ালাম। আমি ঘরকুনো মানুষ। এই প্রথম পঙ্গুতে এলাম। হাসপাতালে প্রবেশ করতে গিয়েই দেখি, দুইজন পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে হাঁটছে। ভয়ে দুরুদুরু বক্ষে ডানে বামে না তাকিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে কীভাবে শান্ত রাখতে হয়, আলহামদুলিল্লাহ! সেই জ্ঞানটা ছিল। আর পাঁচ তারিখের পরদিন সকালে এবং ছয় তারিখ রাতে এর চেয়েও হাজার গুণ ভয়ংকর পরিস্থিতিও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কৃপায়– শান্তভাবে সামাল দিতে পেরেছি। একটু পরেই এর বিবরণ আসবে। ইনশাআল্লাহ।

পঙ্গু হাসপাতাল এমনিতেই খুবই কষ্টের জায়গা। এখানে ভর্তি হওয়া সবারই কোনো না কোনো অঙ্গ কর্তিত। দেখলে গা শিউরে ওঠে। ভেতরের ওয়ার্ডে প্রবেশের আগেই দেখলাম, বারান্দায় রানা প্লাজার গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য বিশেষ অভ্যর্থনা সেল। অনুসন্ধান কক্ষ। আর আমাদেরকে লুকিয়ে-পালিয়ে-অগোচরে চিকিৎসার জন্য আসতে হচ্ছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সরকারি হাসপাতাল। পরিচ্ছন্নতার দারুণ অভাব। কেমন গুমোট আঁশটে গন্ধ। ফিনাইল আর পটাশের উৎকট বদবু। কালো কালো ডাঁশ মাছি বনবন করছে এখানে-ওখানে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল সারি বেঁধে আনাগোনা করছে। বেশ কয়েকটা হুলো বেড়াল উচ্ছিষ্ট নিয়ে ঝগড়া করছে। ভেতরে গাদাগাদি করে অসুস্থরা শুয়ে-বসে আছে। খাটিয়ার তুলনায় রোগির সংখ্যা অনেক বেশি। প্রতিটি পদে পদে ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা ধরা পড়ে। অনেকে মাটিতেই পাটি বিছিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। তারপরও সরকারি হাসপাতালগুলোই গরিবদের ভরসা।

রজীব সাহেব হুজুর বললেন:

– হাসপাতালে না এলে আল্লাহর অনেক নিয়া'মতের কদর মাথায় আসে না। সুস্থ মানুষকেও মাঝেমধ্যে হাসাপাতাল থেকে ঘুরে যাওয়া দরকার। এতে করে মানুষের প্রতি দরদ-ব্যথা বাড়বে। অসহায় মানুষের প্রতি মমতা-ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

আমি মনে মনে ভাবলাম: হুজুরের কথা তো একশত ভাগ ঠিক। তার কথার সূত্র ধরে আরো একটি কথা মনে পড়ে গেল:

– যিনি যে ময়দানের অভিজ্ঞতা রাখেন না, তার কাছে সে ময়দানের ফতোয়া চাওয়া বা পরামর্শ চাওয়া ঠিক নয়। তখন পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত সঠিক আসে না। যিনি তাবলীগ করেন তার কাছে জিহাদের ফতোয়া চাওয়া ঠিক নয়। যিনি তা'লীমের সাথে জড়িত তার কাছে তাবলীগে বের হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া চাওয়া ঠিক নয়। আবার যিনি তাবলীগ করেন তার কাছে জিহাদ ও তা'লীমের ফতোয়া চাওয়া ঠিক নয়। পরামর্শ এমন ব্যক্তি থেকে নেয়া ভালো যিনি সবদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে পক্ষপাতহীন উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু এমন মানুষ তো খুব বেশি নেই।

হুজুরের পিছু পিছু একটি খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সালাম দিলাম। মুসাফাহা করলাম এক মর্দে মুমিনের সাথে। ছোট একটি তালিবে

ইলম কিন্তু একজন বড় মুজাহিদ। ছোট একটি শরীর। কিন্তু বড় একটি মন। ছোট একটি বুক। কিন্তু বিরাট এক হিম্মত। আড়চোখে সমূলে কেটে ফেলা পা-টির দিকে তাকালাম। এ নিয়ে তাকে কোনো প্রশ্ন করলাম না। তার মুখে অমলিন হাসি। মুখে সামান্য গোঁফের রেখা। আমার ধারণার চেয়েও ছোট। সে বলল:

– আমার জন্য দু'আ করবেন।

তার দু'আর আবেদন শুনে আমার চোখের পানি ধরে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। লজ্জায় অন্যদিকে ফিরলাম। আলগোছে চোখের পানি মুছে আবার তার মুখোমুখি হলাম।

ছোট মুজাহিদের সাথে অনেক কথা হলো। একদম তার পাশে, শিয়রের আগে বসলাম। তার মাথার চুলে আলতো করে বিলি কেটে দিলাম। হাতের আঙুল টেনে দিলাম। নানাভাবে তাকে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করলাম। তার মনোবল দেখে আমি কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। এত ছোট একটা মানুষ এমন হিম্মত! তাও সিরাজগঞ্জের এক প্রত্যন্ত অজগাঁর 'মীজানের' তালিবে ইলম! আহ! আমি কী করলাম?

তার পাশেই, ছোট্ট টুলে ঘোমটা দেয়া এক মহিলা– মাথা নিচু করে বসে আছেন। ছোট মুজাহিদ বলল:

– ইনি আমার বড় বোন।

আমরা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, মহিলা তার শ্বশুর বাড়িতে স্বামী-সংসার ফেলে ভাইয়ের সেবায় ছুটে এসেছেন। আমার দু'চোখ আবার ভিজে উঠল, এই মায়ের মতো মমতাময়ী বড় বোনটিকে দেখে। বোনটি পরম মমতায় ভাইয়ের ওষধ-পথ্য তৈরী করছেন।

রজীব সাহেব হুজুর অন্যান্য খাটিয়ার কাছে গিয়ে খোঁজখবর করছিলেন। আমাদের কাছে ফিরে এসে বললেন:

– পাশের খাটিয়ায় যিনি শুয়ে আছেন তিনি সাভারের এক মসজিদের খতীব। তিনিও গুরুতরভাবে আহত। এতক্ষণ তাঁকে খেয়াল করিনি। তাকে পেছনে রেখেই ছোট মুজাহিদের সাথে কথা বলছিলাম। খতীব সাহেবের দিকে ফিরলাম। তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সেলাই। সাদাসিদা মানুষটা বড়ই অমায়িক। এমন অমায়িক মানুষকে কীভাবে বুলেটের আঘাত ঝাঁঝরা করে দিল?

আমাদের মাদরাসায় রান্না খাবার, দুপুর থেকে পাঠানো শুরু হবে। ইমাম সাহেব হুজুরকে দাওয়াত দিলাম। হুজুর আন্তরিকভাবে দাওয়াত গ্রহণ করলেন

শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা

রজীব সাহেব হুযুর বললেন:

– একটু এদিকে আসুন।

গিয়ে যা দেখলাম, চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক বৃদ্ধ মানুষ বিছানার সাথে লেপ্টে শুয়ে আছেন। দুটো হাতই মারাত্মকভাবে ভাঙ্গা। ডানহাতটা তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। বুলেটের নির্মম আঘাতে হাতের হাড়গুলো কুচি কুচি হয়ে গেছে। এই বৃদ্ধের গায়ে কেউ হাত তোলার কথা চিন্তা করবে? আমরা কোন যুগে বাস করছি? সমাজের এহেন অধঃপতনের জন্য দায়ী কি আমরা উলামায়ে কিরাম নই? এই বৃদ্ধ লোকটার দোষ কি এটাই যে, তিনি নবীজির মহব্বতে ছুটে এসেছেন। এই মানুষটা মাদানীনগর মাদরাসা রক্ষা করতে এসে আহত হয়েছিলেন।

এত বৃদ্ধ মুজাহিদ থাকতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না। এতদিন আমার ভাবনা ছিলো প্রতিবাদ-আন্দোলন এসব যুবকদের কাজ। বৃদ্ধরা ঘরে বসে শুধু উপদেশ দিবেন আর নিজের অভিজ্ঞতার লেনদেন করবেন। এই অকুতোভয় বৃদ্ধ সিংহকে দেখে আমার ভুল ভাঙলো। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল। বৃদ্ধ মানুষটাকে দেখলাম, নিরুদ্বেগে জোহরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

যাদের সাথে দেখা হলো, তাঁরা সবাই গরীব। অত্যন্ত গরীব। এনাদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসা দরকার। কিন্তু অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। রজীব সাহেব হুজুরকে দেখলাম, ওখানের সবাইকে অত্যন্ত আপন ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তারাও হুজুরের কথা শুনে অভয় পাচ্ছে।

আমরা আবার ছোট মুজাহিদের কাছে আসলাম। ও হাসছে। ও নাকি সবসময় জিকির-ফিকিরে থাকে। হাতে তসবীহও দেখলাম। মাশাআল্লাহ। হুজুর বললেন:

– আমরা তার জন্য খুব ভালো একটা পা লাগানোর ফিকির করছি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে।

আশেপাশে আরো কয়েক জন ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তাদের বাহ্যিক অবয়ব দেখে বলে দিচ্ছিল, তারাও শহীদ চত্বরের জখমি। ভয়ে বা সংকোচে পরিচয় দিচ্ছিলেন না। আমরা তাদেরও হাল-পুরচি করলাম। আমাদেরকে দেখে ওয়ার্ডের আরো অনেকে তাদের দুরবস্থার কথা খুলে বললেন। মজার ব্যাপার হলো, কাউকে কাউকে দেখলাম নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলছে:

– আমরাও সেদিন পুলিশের আঘাতে জখম হয়েছি। আবার কারো কারো চেহারা দেখে মনে হলো, তারা কেন সেদিন পুলিশের হাতে আহত হয়ে এখানে এল না, এজন্য লজ্জিত।

আমরা সেদিন থেকে প্রতিদিন, গড়ে দশজনের খাবার তিনবেলা পৌছানোর চেষ্টা করেছি। আমরা মাদরাসায় যা প্রত্যহ খাই, হাসপাতালের মেহমানগণের খাবার ভিন্নভাবে, আরো ভালোভাবে, আলাদা করে রান্নার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছি। এটা করতে গিয়ে আমাদের তালিবে ইলমদের খাবার দিতে অনেক অনিয়ম করতে হয়েছে। মাশাআল্লাহ, তারা হাসিমুখেই এই কষ্টটুকু মেনে নিয়েছে। আমরা এই মেহমানদের সর্বোচ্চ খেদমত করার চেষ্টা করেছি। কতটুকু কী হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন। মাঝেমধ্যে রুগির সংখ্যা একজনেও নেমে আসতো, আবার কখনো পনেরো জনেও উঠে যেতো।

পঙ্গু, সোহরাওয়ার্দি, চক্ষু, কল্যাণপুরের ইবনে সিনা। এই চারটা হাসপাতালে আলাদা করে খাবার পাঠানো যে কতটা দুঃসাধ্য ছিল, তা একমাত্র ভুক্তভুগীরাই বলতে পারবে। পাশাপাশি গোপনীয়তার কথাও মাথায় রাখতে হতো। মাদরাসার আশপাশটা সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আলহামদুলিল্লাহ, শেষ পর্যন্ত বাহ্যিক কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

পঙ্গু হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আমরা, রাস্তার ওপাশে চক্ষু হাসপাতালের দিকে রওয়ানা দিলাম। চক্ষু হাসপাতালটা নতুন হয়েছে। এখানে কার্যক্রম শুরু হয়েছে বেশি দেরি হয়নি। এই হাসপাতালে পুলিশের আনাগোনা পঙ্গুর তুলনায় বেশি। শহীদ চত্বরে যারা আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে চোখে আঘাত প্রাপ্তদের সংখ্যাই বেশি। কানেও সমস্যা দেখা দিয়েছে অনেকের। পুরো ঘটনাকালকে বিশ্লেষণ করে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো

এক: যারা ৫ তারিখে দিনের বেলায় আহত হয়েছেন, তারা সবাই বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। অথবা বুলেটবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছেন।

দুই: ৫ তারিখ সন্ধ্যার পরে যারা আহত হয়েছেন, তারা বেশির ভাগই গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

তিন: যারা গভীর রাতের দিকে আহত হয়েছেন, তারা গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড এবং বুলেট, ত্রিমুখী আক্রমণে আহত হয়েছেন বা শহীদ হয়েছেন।

আরও দূরে

এরই মধ্যে একবার দুইজন শহীদ ও একজন আহত ভাইকে দেখতে চট্টগ্রামে গেলাম। আহত ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে। এই হাত ভেঙ্গে ফেলা ভাইটিকে দেখে নির্বাক হয়ে গেলাম। ভাইটা রিকশা চালান। শারীরিক অবস্থা খুবই নড়বড়ে। পরিবারে অন্য কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই। তাকে দেখে ধার্মিকও মনে হলো না। কিন্তু পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবের জবানিতে বুঝলাম, ভাইটি দিলে দিলে একজন আশেকে রাসূল (সা.)।

সেদিন ছিলো ব্যান্ডেজ খোলার দিন। মানুষটার সরল চোখদুটি উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল। যেন এই নির্মম ঘটনা বুঝে উঠতে পারছিল না। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেশির ভাগই শাদা। মনটা হু হু করে উঠল। এই মানুষটা কীভাবে চলবে? তার সংসার কীভাবে চলবে? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা চালাবেন। তাওফীকে যা ছিলো, তা দিয়েই ভাইটির খেদমত করার চেষ্টা করলাম। ভাইটাকে বিদায় জানানোর সময় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও আল্লাহ! এ অসহায় ভাইটার এখন তুমি ছাড়া যে আর কেউ রইল না!

রজীব সাহেব হুজুর চক্ষু হাসপাতালে প্রবেশ করতেই, ওনার পরিচিত এক ডাক্তারকে সেখানে পেলেন। ডাক্তার সাহেবের সাথে আহতদের চিকিৎসা সেবার ব্যাপারে আলাপ করলেন। সাহায্য চাইলেন। ডাক্তার সাহেব আশ্বাস দিলেন।

দোতলায় উঠেই দেখি পুলিশ সতর্ক প্রহরায় আছে। হুজুরের সাথে আমিও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ওয়ার্ডে প্রবেশ করলাম। তিনজন আহত ভাই

পাশাপাশি শুয়ে আছেন। এখানে দেখি অনেক অনেক ভাই শুয়ে আছেন। ভাইদেরকে দেখে যা মনে হলোঃ

এক: একচোখ হারিয়েছেন। আরেক চোখ লাল। পানি পড়ে। চোখে কালো চশমা।

দুই: দুই চোখই হারিয়েছেন।

কিছু ভাই দেখলাম, দু'চোখ থেকেই পানি ঝরছে। অপারেশন যেমনটা হওয়া দরকার তা হচ্ছে না। অনেককে দেখলাম বাহির থেকেই অপারেশন করিয়ে আনছেন। এখানে শুধু থাকছেন। এতে খরচ কিছুটা হলেও কমে।

পঙ্গু হাসপাতালের প্রতিকূলতা আর চক্ষু হাসপাতালের প্রতিকূলতার ধরন এক নয়। পঙ্গু হাসপাতালে হয়তো প্রশাসনিকভাবে, আমাদের ভাইদের সাথে বিরূপ আচরণ করা হয়নি। কোনো কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে আহত ভাইদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। কিন্তু চক্ষু হাসপাতালের অবস্থা ভিন্ন। এখানে উপর মহলের সচেতন দৃষ্টি সারাক্ষণ নিবদ্ধ ছিল। যে সমস্ত মহৎপ্রাণ ডাক্তার আমাদের ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। তাদেরকে বদলি করে দেয়া হচ্ছিল। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাযুক। আমরা যারা এসবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম তারা বড় পেরেশান ছিলাম। এখন কী হবে? আল্লাহর এই অসহায় বান্দাদের চিকিৎসা কীভাবে হবে?

রজীব সাহেব হুজুর এবং তাঁর মতো আরো যারা এই খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তারা বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। এসব প্রতিকূলতার মাঝেই কাজ এগিয়ে চলছিল।

এখানে দেখা পেলাম আরেক মহৎপ্রাণ মানুষের। জামিআ' রাহমানিয়ার ফাযিল, মাওলানা মা'মুন। রজীব সাহেব হুজুরের ছাত্র। যখনই আমরা গিয়েছি, তাকে কাছে পেয়েছি। তিনি পাশের এক মসজিদের ইমাম। তিনি সময়-শ্রম দিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার মসজিদের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তিনি পিছপা হননি। এখনো পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছেন। না হলে পৃথিবী থাকতো না। মানুষের মহত্ত্ব আমাকে আপ্লুত করে। আমি ভালো মানুষের সন্ধানে থাকি, সবসময়।

আরেক জন মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম। মুহাম্মাদপুরের মা'হাদু উলুমিল কুরআনে। মাওলানা নুরুল্লাহ। এই তরুণ মাওলানার আবেগ, উম্মাতের

আমাদের ইন্তিফাদা ১৫

জন্যে সার্বক্ষণিক ফিকির, আহত ও শহীদ ভাইদের সাহায্যের জন্যে দিনরাত মেহনতও আমাকে আপ্লুত করেছে।

চক্ষু হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে গিয়ে খোঁজ করে দেখছি, আমাদের কোনো ভাই আছেন কিনা। সরাসরি জিজ্ঞাসাও করা যায় না। চেহারা-সুরত দেখে মনে হলে কাছে এগিয়ে গিয়েছি।

এক ভাই, দেখলাম মুখে দাড়ি। গায়ে শার্ট। সাধারণ আটপৌরে। কালো চশমা চোখে ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছেন। কী করতেন জানতে চাইলাম। বললেন, তিনি গুলিস্তানের ফেরিওয়ালা ছিলেন। নবীজির টানে ছুটে এসেছিলেন। কোনো আক্ষেপ নেই। বিয়ে করেননি। বৃদ্ধা মা আছেন। এই ভাইটির দু'চোখই শহীদ।

পাশের বিছানায় আরেক ভাই। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। দাড়ি নেই। একটা চোখ শহীদ। শান্তভাবে বসে আছেন। দিনমজুর। তাকে দেখাশোনা করছিল ছোট ভাই। ভাইয়ের খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

এই ভাইদের ভবিষ্যতের চিন্তা কী? আমাদের কি কোনো ভাবনা আছে? তাদের পুনর্বাসনের কোনো চিন্তা কি আমরা করেছি? আমরা তো গুছিয়ে কোনো কাজ করতে পারি না। একসাথে কাজ করতে পারি না। ইত্তিফাকে গেলেই ইখতিলাফ করে বসি। এই যে এতগুলো মানুষ শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে গেলেন, এদের জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই? নবীজি কিয়ামতের দিন যদি প্রশ্ন করেন:

– আমাকে ভালোবেসে এই মানুষগুলো ছুটে এসেছিলো। বুকের তপ্ত খুন ঢেলে দিয়েছিলো। নিজের শরীরের মূল্যবান অঙ্গ কুরবান করে ছিলো, তুমি তাদের জন্য কী করেছো?

তখন আমাদের জবাব দেয়ার মতো কিছু থাকবে? বিষয়টা কি আমাদেরকে ভাবিত করে না? বিচলিত করে না? আমরা কাজ শুরু করে শেষ পর্যন্ত যেতে পারি না কেন? আমাদের আবেগ দু'দিন পরই থিতিয়ে আসে কেন?

আমরা কি পারি না, নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিয়ে আমাদের ভাইদের পাশে দাঁড়াতে? আমরা কি পারি না খরগোশের মতো একদিনেই লম্ফঝম্প না করে, জোশ-হুঁশ ঠিক রেখে, কচ্ছপের মতো ধীরস্থিরভাবে পরিকল্পনা করে, স্থায়ীভাবে কোনো কাজ করতে? আমরা কি পারি না অন্য কিছুর মতো হাজার বছর না বেঁচে, সিংহের মতো একটা মুহূর্ত কাটাতে? আমরা কি পারি

না নিজেদের সব ভেদাভেদ ভুলে এক পতাকাতলে শামিল হতে? আমরা কি...............

আলহামদুলিল্লাহ! রজীব সাহেব হুজুরকে এর ব্যতিক্রম দেখেছি। তিনি সারক্ষণ এই ভাবনায় ডুবে আছেন। এই শহীদ ভাইদের পরিবারের নিয়মিত খোঁজ রাখার চেষ্টা করছেন। আহত ভাইদের চিকিৎসা-ব্যয় যোগাড় করার জন্য দিনরাত প্রাণপাত করে যাচ্ছেন।

যেতে যেতে যেতে : ২

করযে হাসানা

আমাদের সামর্থ্য যাই থাক, আমাদের মাদরাসার তালিবে ইলমদেরকে আমরা ভুলতে দেইনি সেদিনের কষ্টের কথা, সেদিনের বেদনার কথা। সেদিনের রক্তক্ষরণের কথা। আমাদের মাদরাসায় আমরা একটা নিয়ম চালু করেছি, একটা বাক্স রেখেছি, সবাইকে বলে দেয়া আছে:

– তোমার সামর্থ্য যাই থাকুক প্রতিদিন অন্তত একটি পয়সা হলেও 'আল্লাহকে করজে হাসানাহ দাও'। আমাদের অসহায় ভাইদের সাহায্যার্থে তোমার এই একটি পয়সাও অনেক বড়।

তালিবে ইলমদেরকে করজে হাসানা দিতে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই।

– ক্রিকেট খেলায় দেখবে, উইকেটকিপারের হাতে যখন বল যায়, তখন সে ডিসমিসালের সম্ভাবনা না থাকলেও কী করে? সে বলটা স্ট্যাম্পের সাথে আলতো করে ছুঁইয়ে দেয়। সে জানে, ব্যাটসম্যানের ব্যাটের সাথে বলটা লাগেনি। অথবা ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছেড়ে বাইরে যায়নি, সুতরাং স্ট্যাম্পে বলটা লাগালেও ডিসমিসাল হবে না। তারপরও বলটা স্ট্যাম্পে লাগায় নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য। যাতে প্রয়োজনের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাতটা স্ট্যাম্পে পৌঁছে যায়।

তাই তোমরাও যদি করজে হাসানাহ দেয়ার মতো টাকা না থাকে, অন্তত হাতটা বাক্সের কাছে নিয়ে যাবে। মনে মনে দু'আ করবে:

– ইয়া আল্লাহ! আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাওফীক নেই আপনি আমাকে করযে হাসানাহ দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই আহত ভাইয়েরা ঢাকায় আসেন। মাদরাসায় অবস্থান করেন। চিকিৎসা নিয়ে আবার চলে যান। আমরা যথাসাধ্য ইহতিরামের চেষ্টা করি। আমরা সবসময় চেষ্টা করি, যেন সেদিনের চেতনাটা আমাদের থেকে কখনোই হারিয়ে না যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবেই খরগোশের গতির প্রতি মুগ্ধ, তবে কচ্ছপের পরিকল্পিত ধীরলয়তায় আস্থাশীল।

সরল এক মানুষ

যেসব আহত ভাইয়ের নিয়মিত আগমনে আমরা সৌভাগ্যবান, তাদের মধ্যে একজনকে দেখলে প্রতিবারই আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। শিক্ষাগত যোগ্যতা কুরআনের হাফিজ। বাড়ি উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বিয়ে করেছিলেন। 'নাকাবা'র (বিপর্যয়?) আগে এক হিফজখানায় খেদমতে ছিলেন। বয়স খুবই কম। আর্থিক সমস্যার কারণে জীবিকার সন্ধানে নেমে পড়তে হয়েছে। বিয়ে করা নিয়েও শ্বশুর বাড়ি ও নিজ বাড়ি উভয় দিক থেকেই তোপের মুখে।

একদম সরল একজন মানুষ। কথা বলেন খুবই বিনয়ের সাথে। গলার স্বর অত্যন্ত মোলায়েম। কিছুক্ষণ একসাথে থাকলেই এই মানুষটার মায়ায় পড়ে যেতে হয়। দু'চোখেই আঘাত পেয়েছেন। একচোখ সম্পূর্ণ শহীদ। আরেক চোখ থেকে নিরন্তর পানি ঝরে। এই চোখে সারাক্ষণ ব্যথা টনটন করে। যখন ব্যথা ওঠে অসহ্য যাতনায় ছটফট করতে থাকেন। এই অসহায় মানুষটাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেই? যে সহযোগিতা পরিবারের কাছ থেকে পাওয়ার কথা, সে সহযোগিতা আমরা কীভাবে দেই? মায়ের আদর কি 'মাসি' দিয়ে হয়?

আমাদের এই ভাইটির জন্য রমযানে এক জায়গায় হাতে-পায়ে ধরে, খেদমতের ব্যবস্থা করেছিলাম। সেই হিফজখানার কর্তৃপক্ষ যেই শুনল, এই লোক শহীদ চত্বরের আহত, সাথে সাথে না করে দিল। সামনে ঈদ। সবারই সাধ-আহ্লাদ থাকে। বাড়িতে যে যাবে সে ভাড়াটুকুও ভাইটার কাছে নেই। অন্ধ এক আক্রোশে ভেতরটা ফেটে যেতে চেয়েছিলো। এই তো

কদিন আগে মাদরাসায় ভাইটা এলেন। অত্যন্ত কাঁচুমাচু ভঙ্গি। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন:

হুযুর! একটা মাদরাসায় খেদমতে ছিলাম। সাভারের দিকে। কিন্তু চোখে সারাক্ষণ ব্যথা করে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না। ছেলেদের পড়া শুনতে কষ্ট হয়। তাদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। সেজন্য চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন ঘুরে ঘুরে আতর বিক্রি করি। বেশিক্ষণ রাস্তায় হাঁটতে পারি না। রোদের আলো পড়ে চোখটা টাটায়। কচকচ করে। ডাক্তার বলেছেন চোখটা আবার অপারেশন করতে হবে।

হুযুর! আমার কাছে কোনো উপায় নেই।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আমি আর কীইবা করতে পারি? এ বছর মাদরাসার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তবুও তাকে আশ্বাস দিলাম:

– দেখি ভাই, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে দেখবো।

এমনই আরেক ভাই আসেন চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা থেকে। পটিয়া মাদরাসার ফাযিল। এক মসজিদের ইমাম। বড় পরহেজগার আলেম। তিনি এলেও আমরা 'টুটাফাটা' কিছু মেহনত করার চেষ্টা করি। ওনারও চোখে সমস্যা। দূরের কিছুই দেখতে পান না। চলাফেরায় বড় কষ্ট। শেষবার এসেছিলেন ক'দিন আগে। বিভিন্ন ওষুধের প্রভাবে চোখের ভেতরে 'অয়েল' জমে গেছে। এখন আবার অপারেশন করে সেগুলো বের করতে হবে। মানুষটা খুবই নরম হয়ে পড়েছেন। দু'চোখ বড়ই ভোগাচ্ছে তাকে। হাঁটাচলাতেও সমস্যা হচ্ছে। চোয়াল দুটো ভেঙে পড়েছে। অপারেশনের দিন হাসপাতালে গেলেন। প্রতিদিন হাসপাতালে আমরা কেউ না কেউ সাথে যাই। আসল দিনই আমরা কেউ সাথে যেতে পারলাম না। হাসপাতাল থেকে ফোন এলো, বেচারা একা আসতে পারছেন না। একজনকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমার মনটা গেলো খারাপ হয়ে। আহা! এমন একজন মানুষকে একা ছাড়া হলো কীভাবে? খোঁজ নিয়ে জানা গেলো ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝি। রজীব সাহেব হুযুর ঘটনাক্রমে মাদরাসায় ছিলেন, তিনি বললেন:

– আমি সিএনজি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি, একজন গিয়ে ওনাকে নিয়ে আসুক।

হুযুর ওনাকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসতে চাইলেন। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম একজন সাথে যেতে। এই অবস্থায় একটা মানুষকে একা ছাড়ি

কীভাবে? পরে অবশ্য উনিই নিষেধ করেছেন। কাউকে যেতে হবে না, একা যেতে পারবেন। আমরা বাসে উঠিয়ে দিলাম।

আমাদের কথা হচ্ছিল চক্ষু হাসপাতাল নিয়ে। তারপর আমরা ঘুরতে ঘুরতে আরেক ওয়ার্ডে গেলাম। সেখানে দেখলাম একজন আলিমকে। বসে আছেন। চোখে কালো চশমা। মুখে স্মিতহাসি। জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের ফাযিল। শহীদবাড়িয়ার অধিবাসী। এক হেফজখানায় খেদমতরত। বিয়ে করেননি। এই ওয়ার্ডে বেশ কয়েকজন ভাইকে দেখলাম। ফেনির এক ভাইকে দেখলাম। বড় খাবারের কষ্টে আছেন। দু'চোখই আঘাতপ্রাপ্ত। এমন আরো অনেক কষ্টের কাহিনী।

যে ফুল না ফুটিতেই

জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগের শহীদ মাওলানা আনোয়ার শাহ। আমাদের কাজের ধারাবাহিকতায় শহীদ আনোয়ারের (রহ.) শোকাকুল পিতার সাথে যোগাযোগ করলাম। রজীব সাহেব হুজুরই নম্বর সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পিতা সরকারি কর্মকর্তা। নিরাপত্তাজনিত কারণে আগের নম্বরটা বদলে ফেলেছেন। আমরা শহীদের কবর যিয়ারত করার জন্য নোয়াখালি যাবো। দিন-তারিখ ঠিক করা হলো। কুমিল্লা থেকে ফিরে এলেই আমরা শহীদ আনোয়ার (রহ.) এর বাড়িতে যাবো, এমনটাই সিদ্ধান্ত হলো।

ফল পাকার আগেই ঝরে গেলে কৃষকের কেমন লাগে? পাকা ধানে মই দিলে কেমন লাগে? একজন পিতার কাছে কেমন লাগার কথা? সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। লেখাপড়ার শেষপ্রান্তে, চূড়ান্ত সময়ে, ঘরে তোলার সময় ফসল ঝরে গেল, কেমন লাগছে? সবকিছু তো আল্লাহরই জন্য। তিনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

শহীদ আনোয়ারের পিতার সাথে কথা বলে আমি বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছি। নিরুদ্বেগ অকম্পিত গলায় কথা বললেন। এই মহান পিতার সাথে দুইবার কথা বলেছি। দুইবারেই ফোন মারফত। প্রথমবার প্রয়োজনে। দ্বিতীয়বার মনের টানে। একজন সাহসী পিতাকে বোঝার জন্যই দ্বিতীয়বার কথা বলেছি। আমি তাকে সান্ত্বনা দেব কি, উল্টো তিনিই আমার জন্য জীবন্ত সান্ত্বনা হয়ে গেলেন।

আমাদের ইন্তিফাদা ২০

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা প্রায় পঞ্চাশজন শহীদ ও গাজির খেদমত করার তাওফীক লাভ করেছি। সব শহীদ পরিবারে একটি বিষয় লক্ষ করেছি:

– কোনো পরিবারেই আক্ষেপ দেখিনি। আফসোস দেখিনি। কোনো রকমের হা-হুতাশ দেখিনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়েও দমে যেতে দেখিনি। রিজিকের চিন্তায় আকুল হতে দেখিনি। ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হতে দেখিনি। অসংখ্য গাজি সাহেবানের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে। সবাইকেই পরিস্থিতির প্রতি –নিজের অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও– পুরো শোকরগুজার দেখেছি।

যেসব ভাইয়ের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি, যেসব ভাইয়ের খেদমত করার তাওফীক আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন, তাদের সবার সাথেই আমরা পরবর্তীতে বেশ আর কম যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। তেইশ জন শহীদ ও গাজি ভাইদের পরিবারের পূর্ণ ঠিকানা রজীব সাহেব হুজুর সবসময় সাথে রাখেন, যাদের এখনো সাহায্য প্রয়োজন। আমিও হুজুরের কাছ থেকে ঠিকানার একটি নুসখা সংগ্রহ করে রেখেছি। তিনি এতদিন পর এখনো, প্রতি ঈদে-চাঁদে ও বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় বাজারসদাই করে দিয়ে আসেন। খোঁজ-খবর করে আসেন। সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। অভয় দিয়ে আসনে। বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়ে আসেন।

আকাশের কান্না

গত রমযানে একটি শাহাদাতের ঘটনায় বড় মুষড়ে পড়েছিলাম। রজীব সাহেব হুজুরের মারফতেই খবর পেয়েছি। একজন আলেম। মাওলানা আমীরুল ইসলাম। মূল বাড়ি হাতিয়া। বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত রামগড়ের সোনাইপুলের অধিবাসী। জায়গাটা আমার একান্ত পরিচিত। শহীদ আমিনুল (রহ.) তিন সন্তানের জনক। তিনি কওমী মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। মরহুম মাওলানার পিতাও একজন কওমী মাদরাসার উস্তাদ। আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ৫ তারিখে গুলিস্তানে মাথায় গুলি খেয়েছেন। রাস্তাতেই মাথাটা মারাত্মকভাবে ফেটে গিয়েছিল। কীভাবে ঢাকা

মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেউ বলতে পারেনি। প্রায় চল্লিশ দিন সংজ্ঞাহীন ছিলেন। কীভাবে যে ফেটে চৌচির হওয়া মাথাটা জোড়া লাগানো হয়েছিল আল্লাহই জানেন।

মাসাধিক কাল বেহুঁশ থাকার পর হুঁশ ফিরে পেলেও শরীরের সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছিল না। তারপরও মোটামুটি কিছুটা সুস্থ হওয়ায়, রামগড়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো। চিকিৎসার খরচ চালানো যাচ্ছিল না।

কয়দিন পর আবার শরীর অবনতির দিকে গেল। সারাক্ষণ গলায় কফ জমে থাকে। গলা খাঁকারি দিলেও কফ বের হয়ে আসে না। কথার স্বর স্পষ্টভাবে বের হয় না। ভাঙ্গা গলায় কথা বলতে কষ্ট হয়। আবার ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। কর্তব্যরত ডাক্তারগণ গলার নিচ দিয়ে ছিদ্র করে কীভাবে যেন চিকিৎসা করলেন। কোনো রকম সুস্থ হলেন। বাড়ি গেলেন। রজীব সাহেব হুজুর সাধ্যমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা নিলেন। আরো অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। বাড়ি যাওয়ার সময় হুযুর এম্বুলেন্স ঠিক করে দিলেন। রমযানের পঁচিশ তারিখ রাতে মাওলানার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটল। এম্বুলেন্সে করে চট্টগ্রাম নেয়ার পথে শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে রজীব সাহেব হুজুর ঢাকা থেকে ছুটে গেলেন। রোজা মুখে অনেক কষ্টে রামগড় পৌঁছলেন। দুপুর আড়াইটায় জানাজা। সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। মাঝেমধ্যে মুষলধারেও বর্ষণ হচ্ছিল। এত পরে জানাজা তাও আবার বৃষ্টির প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিলো। সবাই সন্দিহান ছিলেন, মানুষ জানাযায় শরীক হতে পারবে কিনা। তেমন করে ই'লানও করা হয়নি। মাশাআল্লাহ, আড়াইটা বাজার আগেই জানাজার স্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে গেল। ফকফকে রোদ হেসে উঠল।

শহীদ মরহুমের শোকাতুর বৃদ্ধ পিতা নামাজের ইমামতি করলেন। নামাজ শেষে রজীব সাহেব হুজুর কিছু কথা বললেন। কারগুজারি শোনালেন। শহীদ মরহুমের পিতার অনুরোধে হুজুর নিজেই মুনাজাত করলেন। আশেপাশে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। মাঠ ভর্তি হয়ে পাশের ঢাকাগামী রাস্তায়ও মানুষ নামাযে দাঁড়ালো। দু'পাশে সারি সারি বাস-ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। শহীদের খবর শুনে অনেক যাত্রীও জানাজা দু'আতে শরীক হলেন। মুনাজাতে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বৃদ্ধ পিতার আকুল কান্না

দেখে বাসের যাত্রীরাও অনবরত চোখ মুছছিল। রজীব সাহেব হুজুর বললেন:

– মানুষের দু'চোখ থেকে অনর্গল পানি ঝরছিল। আর ওপর থেকে সদ্য থেমে যাওয়া বৃষ্টির পানিতে ভিজে যাওয়া পাতা থেকেও টপটপ পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল গাছেরাও কাঁদছে। আকাশ তো আগেই কেঁদেছে।

বর্তমানে মরহুমের বিধবা স্ত্রীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। তিন সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নেই। শ্বশুর থেকে যে সাহায্য পাবেন সে আশাও নেই। কওমী মাদরাসার শিক্ষক বৃদ্ধ শ্বশুর নিজেও খুবই নাজুক অবস্থায় আছেন।

দুর্যোগের ঘনঘটা, বাংলার নাকাবা

মাওলানা রজীবুল হক সাহেবকে দেখলে আমার অবাক লাগে। এই মহৎ মানুষটা এই অসহায় পরিবাগুলোর জন্য, তাদের ভরণপোষণের জন্য হরদম তাজাদম থাকছেন। নিত্যনতুন উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো সাংগঠনিক সহায়তা ছাড়াই একা একা এতবড় একটা কাজ করা অসম্ভবই বলতে হবে। তিনি নিজেই একটা সংগঠন।

আমাদের মাদরাসার পাঁচজন তালিবে ইলম মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। দুজন ৫ তারিখের রাতে। বাকি তিনজন সন্ধ্যায়। দুজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ছিল। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাদের দুজনের জীবন দুলছিল। একজন ৫ তারিখের দিবাগত রাত দুইটার পরে গুলি খেয়েছে। তাকে কোথাও সরানো যাচ্ছিল না। শরীরের সমস্ত রক্ত কুলকুল করে বের হয়ে যাচ্ছিল। অস্থির হয়ে বারবার ফোন করছিল। কান্নার জন্য আমিও কথা বলতে পারছিলাম না। সেও কথা বলতে পারছিল না। শেষ বিদায় চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। অসহায় আক্ষেপে প্রিয় রবের দরবারে ফরিয়াদ জানানো ছাড়া কিছুই করার ছিল না তখন আমার আমাদের সবার। একমাত্র রাব্বে কারীমই সহায় ছিলেন। শেষে মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ সংযোগ আসে আবার চলে যায়। ও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছিল। পাশে থাকা আরেক জনের কাছ থেকে যদ্দূর পারা যায় খবর নিচ্ছিলাম।

ভোর চারটার দিকে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে, 'ওদের' চোখ ফাঁকি দিয়ে পিজি পর্যন্ত পৌছল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই ছিল।

আরেকজনকে ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওখানে তো তিল পরিমাণ জায়গাও নেই। কর্তৃপক্ষ শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েই সবাইকে জোর করে রিলিজ দিয়ে দিচ্ছে। কারণ, বাইরে চিকিৎসা প্রার্থীদের বিশাল লাইন। প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে আহতরা স্রোতের মতো আসছে।

মতিঝিল আর পল্টনের কাছাকাছি এই একটা হাসপাতালই ছিল আমাদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল। অন্যান্য হাসপাতালেও অনেকে গিয়েছেন। পথে পথে বাধা। দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাচ্ছিল না। সেদিকটা দুশমন দলবল নিয়ে দুর্গ বানিয়ে বসে ছিল। রামগড়ের শহীদ মাওলানাও দক্ষিণে গিয়ে গুলি খেয়েছিলেন।

৫ তারিখ বিকেল থেকেই আমাদের অস্থিরতা শুরু হল। আগের রাত থেকেই তালিবে ইলমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ছোটরা মাদরাসায় থাকবে। বড়রা অভিভাবকের অনুমতিসাপেক্ষে যাবে। অভিভাবকরাও সানন্দে অনুমতি দিয়ে দিলেন। রাতেই ব্যানার-ফেস্টুন বানানো ও লেখা শেষ। ভোর রাতে বের হতে হবে। আমাদের গন্তব্য গাবতলী। জামি'আ রাহমানিয়ার সাথেই যাব আমরা। গাবতলী গেল সবাই। সেখানে অবস্থানও করল। কিন্তু জোহরের পরে সবাই শাপলা চত্বরের দিকে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতেও পারছিলাম না।

আড়াইটার পরই খবর এল, মাদরাসার তিনজন তালিবে ইলম গুরুতর আহত। কাকরাইল মোড় থেকে পল্টন ঢোকার পথেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনজনের একজন তো না বলেই মাদরাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। হিফজখানায় পড়ে। যাওয়ার সময় চিঠি লিখে আরেকজনকে দিয়ে গেছে। চিঠির বিবরণ পড়ে মিশ্র অনুভূতি হলো:

– হুজুর! না বইলা যাইতাচি। মাফ কইরা দিয়েন। আমার যদি কিছু হয় মাদরাসার হুজুর গো কুনো দোষ নাই।

ছেলেটাকে দেখলে মনে হতো সাত চড়েও রা কাড়বে না। এখনো তাই মনে হয়। সেদিন এই অমিত সাহস কোথায় পেল? ছেলেটার আম্মু-আব্বু নেই। মাদরাসাই ওর সব দায়দায়িত্ব বহন করে। হেফজখানার আরেক তালিবে ইলম কোন চিঠির ধার ধারেনি। সাথীদেরকে বলে গেল, নাম কাইট্টা দিলে দেউকগা। আমি না যাইয়া থাকবার পারুম না।

আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম:

– এই আচরণগুলোকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবো? নবীজির মহব্বতে গিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উস্তাদের আনুগত্য তো ফরজ। যদি উস্তাদ শরীয়তের সীমায় থাকেন।

যাক এই ছোট ছেলেদের আবেগকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নাহলে কিয়ামতের দিন নবীজি যদি প্রশ্ন করেন:

– কিরে! আমার মহব্বতে ছুটে এসেছে বলে ওকে মাফ করে দিলে না কেন?

তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা সবার আগে থাকবে। আমি 'ব্যক্তির' কাছে যেটা ভালো মনে হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যষ্টির কাছে সেটা ভালো নাও হতে পারে।

৬ তারিখ সকাল। নির্ঘুম এক রাত শেষ হলো। রাত বারোটার দিকে ময়দান থেকে কিছু কিছু তালিবে ইলম ফিরে এসেছে। বাকিদের চিন্তায় অস্থির পায়চারি করছিলাম। ভোর নাগাদ মোটামুটি সবাই এসে গেলো। আহতরা ছাড়া। দুইজন গুরুতর আহতের কোনো খোঁজ নেই। একজন সম্পর্কে জানা গেল, কাকরাইলের আশেপাশে কোথাও এক মসজিদে আছে। হিসাব করে দেখা গেল, প্রায় সাতজনের মতো তালিবে ইলম অনুপস্থিত। ফজরের পর নাগাদ আরো কয়েকজন ফিরল। কিন্তু সেই চিঠি- মুজাহিদ আটকা পড়ে আছে। একটা হাত মারাত্মকভাবে ভেঙে গেছে। একটা পায়ের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। প্রতিটি অলিতে-গলিতে প্রহরা। 'ওরা' ওঁত পেতে বসে আছে। মাদরাসার তালিবে ইলম বা টুপি দাঁড়িওয়ালা দেখলেই বেধড়ক পেটাচ্ছে। পুলিশে দিয়ে দিচ্ছে।

পুরো বাংলাদেশ নিস্তব্ধ। নির্বাক। পুরো ঢাকা শহর থমকে আছে। ঝিম ধরে আছে। গতরাতে কী হলো? এই প্রশ্ন সবার মনে। আমাদের মাদরাসার গলির মুখেও কঠোর প্রহরা বসানো হল। তালিবে ইলমরা ফিরছে। কয়েকজন তালিবে ইলম আহতদের খোঁজে গিয়েছে। রাতে গুরুতর আহত হয়ে ফেরা একজনকে চিকিৎসার জন্যে বাইরে নিয়ে গেছে আরেকজন। ভেতরে যারা আছে ওরা বেরুতে পারছে না। বাইরে যারা আছে তারা ভেতরে আসতে পারছে না। গলির মুখে বাধা পাচ্ছে। জেরার সম্মুখীন হচ্ছে। দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেরা নির্ঘুম আর অভুক্ত। তার উপর আবার এই

নতুন করে জুলুমে ছোট তালিবে ইলমরা ক্ষুধায়-ঘুমে দিশেহারা হয়ে পড়লো।

একজন ফোন করে জানালো, সেই চিঠি-মুজাহিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে কাকরাইল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। মাদরাসার গলিতে ঢুকতে পারছে না। ছেলেটাকে কোথাও শোয়াতে হবে। জানা গেল, কিছুক্ষণ আগে, অন্য মাদরাসার এক তালিবে ইলমকে 'ওরা' পিটিয়ে পিটিয়ে আমাদের গলিতে ঢুকিয়েছে। তারপর তালিবে ইলমটাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে এক গভীর নর্দমায় ফেলে রেখেছে। এলাকার এক ভাই এগিয়ে এলেন। তার সহায়তার বাইরে যারা ছিল তাদেরকে ভেতরে আনা হলো। আমাদের দু'জন তালিবে ইলমকে গলির মুখে লোহার রড দিয়ে পেটানো হলো। একজনকে ধরে তারা জেরা করে জানতে চাইল:

– বল, আর কে কে গিয়েছে তোর সাথে? তালিকা কই দেখা?। ছেলেটা ভয়ে আমার নাম বলল। ওরা ছেলেটাকে টেনেহিঁচড়ে মাদরাসায় নিয়ে এল। প্রায় দশজন। রুক্ষ চেহারা। মারমুখো ভঙ্গি। হাতে লাঠিও আছে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অভুক্ত ছেলেরা ঘুমুচ্ছে। ওরা কাউকে কিছু না বলে টেনে টেনে কম্বল হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে, ওদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করতে লাগল:

– এই হুজুর! হেফাজতে গিয়েছিলি? তোর সাথে কে কে গিয়েছিলো তালিকা কই?

আমি একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার সন্তানদের এহেন অপমানে অধীর হয়ে এগিয়ে গেলাম। তাদেরকে বললাম:

–ওদের সাথে এমন করছেন কেন? ওরা ঘুমুচ্ছে। যা বলার আমাকে বলুন।

-কারা কারা হেফাজতে গিয়েছে? তার তালিকা দিন।

-তালিকা তো নেই।

-হুযুর মিথ্যা বলেন কেন?

-মিথ্যা বলার প্রশ্নই আসে না। মিথ্যা বলব কেন?

মাদরাসার পাঁচতলায় সেই চিঠি-মুজাহিদ শুয়ে ছিল। ছেলেটার আপাদমস্তক সাদা ব্যান্ডেজে আচ্ছাদিত। তাকেও নির্মমভাবে টেনে তুলে ফেলল। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো। কয়েক জন এক নাগাড়ে আমাকে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিল:

– তালিকা কই? তালিকা কই?

অদূরে তালিবে ইলমরা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এভাবে 'ওরা' যদি আমাকে নাজেহাল করতে থাকে তালিবে ইলমরা স্থির থাকবে না। তখন পরিস্থিতি সীমাহীন ঘোলাটে হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে বললাম:

– আসুন, মাদরাসার দফতরে আসুন। ওখানে গিয়ে কথা বলি?

একজন বলল:

– আরে রাখ তোর (?) দফতর। আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। মাদরাসায় এসে এমন অকথ্য শব্দ ব্যবহার করতে পারে? আমরা তখনো মাসজিদেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আল্লাহর ঘরে এই শব্দ উচ্চারণ করতে এর কি একটুও বাধলো না?

'ওরা' আরো কয়েকজন এল। এরা আগের তুলনায় আরো বড় পদস্থ। এসেই সরাসরি প্রশ্ন:

– এই হুজুর! গতকালের ডাকাতি করা স্বর্ণ কী করছস?

আমি তখন সমস্ত লাজ-লজ্জার উর্ধ্বে। সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। তারপরও তাদের এমন ব্যবহারে লজ্জায় দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। অপমানে মুখের লালাগুলো তিতা মনে হচ্ছিল। বারবার মনকে বোঝাচ্ছিলাম:

– মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। শান্তভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। না হলে এতগুলো তালিবে ইলমের ওপর নির্যাতনের স্টীমরোলার নেমে আসবে। মাদরাসার ওপর আঘাত আসবে। বারবার আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলাম। একটা রাস্তা যেন তিনি বের করে দেন। আগের সেই লোকটা আবারও বলল:

– সোনা কই রাখছস, ক ।

কয়েকজনকে পাঠাল, বলল:

– পুরো মাদরাসা দেখে আয়, বাইতুল মোকাররম থেইক্কা লুট করা স্বর্ণ কোনহানে রাখছে।

একজন প্রশ্ন করল:

– ইসলাম কার?

আমি বললাম:

– আল্লাহর।

সেই পন্ডিত বলল:
– আল্লাহর মাল আল্লাহই রক্ষা করবো। তুই কোন (?) ফালাইতে গেছিলি।

এরা মানুষ না অন্য কিছু? এমন কথোপকথনের মুখোমুখি তো কোনোদিন হইনি? হজম করে নিতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, তালিবে ইলমরা কিছু একটা করে ফেলতে পারে। ওদেরকে বললাম:
– তোমরা যাও। যাও, যাও। নিজ নিজ কাজে যাও।

তালিবে ইলমরা অদূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। এরই মধ্যে যারা লুঠের স্বর্ণ খোঁজ করতে গিয়েছিল ওরা খালি হাতে ফিরে এল। ওরা ফিরে আসার পর, আবার নতুন করে জেরা শুরু করল:
– কারা কারা গিয়েছিল? তালিকা কই? তালিকা দেন।
আমি বললাম:
– তালিকাতো নেই।
নেতাগোছের একজন বলে উঠল:
– এই, থানায় ফোন দে। ওসি সাবরে আইতে ক।
হুজুর তালিকা দেন, নইলে থানায় ধইরা লইয়া যামু!
– আমি তালিকা দিতে পারবো না, থানায় নিবেন কিনা সেটা আপনার মর্জি।
দরজার বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকে আরেক জন বলল:
– শফী হেরে কয় লাখ টেহা দিছে জিগান!
একজন বলল:
– হেফাজত কত টাকা দিছে আপনারে? জনপ্রতি কত করে? আমি তো শুনছি দুইলাখ দিছে, ত্রিশ হাজার অন্যরারে দিয়া বাকিটা আপনি মেরে দিছেন? আপনার চেকবই কই দেহি?

তারা দফতরে ঢুকে খোঁজাখুঁজিতে নেমে পড়ল। এর মধ্যে আরেকজন এগিয়ে এসে বলল:
– হুজুরের কম্পিউটারে কী আছে দেহেন।

একজন প্রিয় তালিবে ইলম আর থাকতে না পেরে মারমুখো হয়ে এগিয়ে এসে বলল:

– এই আপনারা পেয়েছেন কি? আমি তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম।

ওরা কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে গেল? তালিবে ইলমটা বলল:

– খবরদার ওটা ধরবেন না, জীবনে ল্যাপটপ কখনো দেখেছেন?

নেতাগোছের কয়েকজন দেখল, পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। ওরা কামরার বাইরে চলে গেলো। বাইরে গিয়ে হুমকি দিয়ে বলল, রাতে বিচার বসাবে।

যে দু'জন তালিবে ইলমকে ওরা বাহির থেকে ধরে এনেছিল ওদের ছবি তুলে নিল। এলাকার সেই হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইটি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে তাদেরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন। এবার তিনি শক্ত করেই বললেন:

– এই অনেক হয়েছে, এবার চল। সবাই গালিগালাজ–খিস্তিখেউড় করতে করতে চলে গেল। শাসিয়ে দিয়ে বলে গেল, রাতে বিচার বসাবে। কত টাকা খেয়েছি তার হিসাব দিতে হবে। ওরা মাদরাসায় সাহায্য করে, আর সেই সাহায্য খেয়ে আমরা এই করছি?

মাদরাসার একজন শিক্ষককেও ওরা গলির মুখে চপেটাঘাত করেছে। আল্লাহর কি অদ্ভূত মহিমা ! যে লোকটি তালিবে ইলমের গায়ে হাত তুলেছিল আর যে লোকটি অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছিল, দু'জনই আপন ভাই। ঘটনার কিছুদিন পরে, যে ভাইটা তালিবে ইলম ও একজন উস্তাদের গায়ে হাত তুলেছিল, তাকে একদিন তার বিরোধী পক্ষ ধরে কুপিয়ে হাতের আঙুল কেটে দিয়েছে। অনেকদিন হাসপাতালে থেকে তারপর ছাড়া পেয়েছে। এখন তার এক হাতের আঙুল নেই। সেদিন তাকে মেরেই ফেলতো। নিতান্ত ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে।

আর যে ভাই অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করেছিল, তাকেও আল্লাহ ছেড়ে দেননি। ঘটনার কিছুদিন পর এলাকায় একটা ডাকাতি হয়। সবার সন্দেহ ছিল এই লোকটার প্রতি। মোটামুটি সবাই বিশ্বাস করতো এই লোকটাই ডাকাতি করেছে। কিন্তু নেতার ভাই হওয়াতে ভয়ে কেউ কিছু বলতো না। কিন্তু লোকটার বেপরোয়া আচরণে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে একজোট হয়ে বিচার বসালো। বিচারে রায় হল, ওকে এলাকা ছেড়ে দিতে হবে। কখনো এই এলাকায় ঢুকতে পারবে না। লোকটি এখন এলাকা থেকে বহিষ্কৃত। তার ভাইও বহিস্কৃত।

বিচারের কাঠগড়ায়

জোহরের পর আমার কাছে খবর পাঠানো হলো, এশার পর বিচার বসবে। আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সবাই পরামর্শ দিল, কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করতে। বড় তালিবে ইলম যারা ছিল তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। উস্তাদদেরকেও জোর করে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। জোহরের আগেই আলাদা আলাদাভাবে, ভিন্ন ভিন্ন পথে যে যার নিরাপদ গন্তব্যে চলে গেলো। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে মাদরাসায় থেকে গেলাম। তালিবে ইলম যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে লেখাপড়ার মেহনতে লেগে গেলাম। আসরের পরে সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দু'আ করলাম। ভেবে দেখলাম, আমি যদি চলে যাই, তাহলে পুরো মাদরাসার উপর আঘাত আসবে। আমি উপস্থিত না থাকলে একটা কলংক লেগে যাবে। হুজুর ভয়ে পালিয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-শিক্ষক সবার কাছ থেকেই বারবার ফোন আসছিল, সবাই অনুরোধ করছিল সরে যাওয়ার জন্য। পরে যা হওয়ার হবে। সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। রাব্বে কারীমের কাছে বারবার দয়া ভিক্ষা করলাম।

এশার আজান হয়ে গেল। উপস্থিত সবার মুখে শঙ্কার ছায়া। ওদেরকে দেখে আমার ভেতর ভালোবাসা আরো গভীর হলো। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, আল্লাহ তা'আলা সহায়। যাই হোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক আমার এই সন্তানদের কাউকে আমি ধরিয়ে দেব না। কারো নাম বলব না। মিথ্যার আশ্রয় নেব না, ইনশাআল্লাহ। সময় যতই গড়াতে লাগলো, আমিও কেমন অসহায় বোধ করছিলাম। কখনো মনে হতে লাগল, চলে গেলেই মনে হয় ভালো হতো। পরক্ষণেই আবার আল্লাহ 'আযম' ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন।

ওরা সারাদিন গলির মুখে পাহারায় ছিল। তারপরও চাইলে ওদের চোখে ধুলো দেয়া কোনো ব্যাপার ছিল না। এখনো আত্মগোপন করতে চাইলে সুযোগ আছে। একজন বলল, হুন্ডা নিয়ে এসে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা শেষতক সিদ্ধান্তে অটল থাকার তাওফীক দিলেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

এর মধ্যে দুইজন আহতের সেবাযত্ন যাতে ঠিকমতো হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হচ্ছে। মাদরাসার বাইরে থাকা কয়েকজন তালিবে ইলমের

অবস্থান তখনো নির্ণয় করতে পারিনি। ওরা কি শহীদ না গাজি, তার সংবাদ বের করা যাচ্ছিল না। বিকেলের দিকে একজনের খবর পেলাম, যে রাত দুইটার পরে গুলি খেয়েছিল। সে হুঁশ ফিরে পেয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ভীষণ ক্লান্ত। মাথার ভেতরে গুলি ঢুকেছে। বের করা যাচ্ছে না। এখন বের করতে গেলে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। ডাক্তার বললেন:

– এভাবে গুলি নিয়েই কিছুদিন থাকুন। মাথার অন্য ক্ষতস্থানগুলো ঠিক হলে তারপর এই গুলিটা বের করা যাবে।

আমি না থাকলে মাদরাসা কে দেখাশোনা করবে। সব সকালেই ওদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছিলাম। কোন কাজ কীভাবে হবে,সব ঠিক করে দিয়েছি। আমার বাড়ির দিকে লক্ষ রাখতে অনুরোধ করেছি। এশার নামাজ শেষ হলো। মসজিদভর্তি লোকজন। এলাকার গণ্যমান্য কেউ বাদ নেই। সবাই 'হুজুরে'র বিচার করতে বসেছেন। আবার অনেকে তামাশা দেখতে বসেছেন। নেতাদের পক্ষে প্রায় বিশ-পঁচিশজন। সবাই মোটরবাইক নিয়ে এসেছে। মসজিদের সামনের চত্বর মোটরবাইকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। যেনো হুন্ডার মেলা বসেছে। সবার হাতে দামি দামি মোবাইল। মসজিদে বসেই গেমস খেলছে। কথা বলছে। বিচারের আসর বসেছিল মসজিদের দক্ষিণ পাশে। আমি উত্তর পাশে বসে বসে জিকির করছিলাম। মুরুব্বিরা কথা শুরু করলেন।

– কই, হুজুর কই? হুজুরকে ডাক।

আমি ওঠে গেলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম আচার ও আচরণ স্বাভাবিক রাখতে। অপমানে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে তো কখনো পড়িনি। বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে এল:

– আমি ভয় পাচ্ছি কেন? আমি লজ্জা পাচ্ছি কেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। আমি তো প্রিয় নবীজিকে ভালোবেসেছি, আল্লাহর কালামকে ভালোবেসেছি, আমার সন্তানতুল্য তালিবে ইলমদেরকে বাঁচাতে চেয়েছি।

মনে আর কোনো ধরনের গ্লানি-ভয়-সংকোচ রইল না। মাথায় আর কোনো দুশ্চিন্তা রইল না। গিয়ে সবাইকে সালাম দিলাম। আমি বসার পর দেখলাম আরো দু'একজন হুন্ডা নিয়ে হাজির হলো। চেহারা-সুরত দেখে মনে হলো, উপস্থিত লোকদের মধ্যে সিআইডির লোকও আছে। মাথার চুলের কাটিং দেখে অন্তত তাই মনে হলো। অল্প বয়সী কয়েকজন নেতা উসখুশ করে বলে উঠল:

– তাড়াতাড়ি বিচার করেন। তাদের কথার খেই ধরে সকালের নেতাটি বলল:

– হুজুর হেফাজত থেকে দুই লাখ টাকা পাইছে। হেই ট্যাহা কী করছে, তাকে জিগান।

আমি শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ করে বললাম:

– এখানে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি।

নেতাটির দৃঢ়োক্তি শুনে মুরুব্বিদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে ফেলল যে, আমি টাকা পেয়েছি। তারাই নিজেদের মধ্যে আলাপ জুড়ে দিল:

– টাকা-পয়সার লেনদেন না হলে কি এত লোক আসে? সবাই না পেলেও উপরের সারির নেতারা তো অবশ্যই টাকা পেয়েছে। নাহলে হুজুর হইয়া হেলিকপ্টারে চড়ে কীভাবে?

আমি পরিস্থিতি দেখে আমার কৌশল ঠিক করলাম:

– আমাকে চুপচাপ থাকতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা যাবে না। আমাকে সরাসরি প্রশ্ন না করলে মুখ খুলবো না।

নেতাটি বলল:

– কে কে হেফাজতে গেছে তার তালিকা দেন। আমরা তালিকা চাই। তালিকাডা দিয়া দিলে বিচার শেষ।

আমি বললাম:

– আমার কাছে কোনো তালিকা নেই। তালিকা দেয়া সম্ভব নয়।

নেতাটি আবারও গ্রেফতারির হুমকি দিল। আমি সকালের মতোই দৃঢ়ভাবেই বললাম:

– আপনি চাইলে পুলিশে দিতে পারেন। আমি আমার ছেলেদের নাম দিতে অপারগ।

বুঝতে পারছিলাম, কথাগুলো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আগেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম:

– সব বিষয়ে নমনীয় ভাব প্রকাশ করলেও আমার ছেলেদের ব্যাপারে একচুলও নড়বো না।

পরিস্থিতি যাই হোক। আমি তো গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েই বিচারে বসেছি। আমি জানি, আমি একজন গ্রেফতার হলে আমার ছেলেরা বেঁচে যাবে। আর ওরা গ্রেফতার হলে আমি মাদরাসায় থেকে কী করবো?।

আমার দৃঢ় অস্বীকৃতি দেখে নেতাটি খেপে গেল। সাথে সাথে মোবাইল হাতে মসজিদের বাইরে চলে গেল। আমি ভেতরে ভেতরে প্রমাদ গুনলাম। মোবাইলে আলাপ সেরে আবার এসে বসল। ড্যাম কেয়ার ভাব চেহারায়।

মুরুব্বিদের একজন প্রশ্ন করল:

– বাবা-মা তাদের ছেলেদেরকে এখানে লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছে। আর আপনারা তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। রাজনীতি করছেন? নিজেদের স্বার্থে ব্যবাহার করছেন।

– আমরা মাদরাসায় যাই করি না কেন, অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া একজন ছাত্রকে কোথাও পাঠাই না। এমনকি ওয়াজ মাহফিলেও না। আমি স্বীকার করছি যে, আমাদের এখানের কেউ কেউ গতকাল অবরোধে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু সেটা অভিভাবকের ফোন পাওয়ার পর আমরা তাদেরকে যেতে দিয়েছি।

আমাকে জেরা করছে, এমন সময় এলাকার আরেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে হাজির। দরজা দিয়ে ঢুকেই ভীষণভাবে চীৎকার করে বলতে লাগল:

– সবকটা হুজুরকে মাদরাসা থেকে তাড়ান। আমরা দান-খয়রাত করবো, সাহায্য-সহযোগিতা করবো, আর তারা কোরান শরীফ আগুন দিয়ে পোড়াবে। মানুষের ব্যবসার স্বর্ণ লুট করবে। সরকারি গাড়ি জ্বালাবে। রাস্তার আইল্যান্ডের গাছ কাটবে।

লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ বকাঝকা দিল। লোকটার উগ্র বক্তব্য আমার জন্য শাপে বর হলো। এতক্ষণ ধরে যারা বিচার করছিলেন তাদের আঁতে ঘা লাগল। একজন বলল:

– আমরা বিচার করছি আপনি আবার বাইর থেকে হঠাৎ এসে কথা বলা শুরু করলেন কেন?

এটা নিয়ে তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো।

একজন প্রশ্ন করল:

– হুজুর, আপনার মাদরাসায় কয়জন মরছে? লোকটার প্রশ্নের ধরন দেখে আল্লাহ তা'আলার কথা মনে পড়ে গেল। খোদার রাহে যারা শহীদ হলো তাদের মৃত বলো না। তারপরও স্বাভাবিক স্বরে বললাম, আমাদের ছাত্রদের কেউ মারা যায়নি।

– আহত হয়েছে কতজন?

– আহত হয়েছে এমন কয়েক জন আছে। তাদের বেশির ভাগই নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে।

আমি ঠিক করেছি যাই হোক মিথ্যার আশ্রয় নেব না। আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছেন। এরই মধ্যে দেখলাম, সেই নেতাটি একজনের কানে কানে কী যেন বলল। এরপর সে লোকটা মাদরাসার ভেতরে গেল। আড়চোখে তার দিকে নজর রাখছিলাম। ভেতরে ভেতর চাপা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এই লোক মাদরাসায় গিয়ে না আবার কোনো সমস্যা বাঁধায়। মাদরাসায় তো কোনো বড় ছেলে নেই, কোনো শিক্ষকও নেই। ছোট যারা আছে তারা কি বলতে কী বলে ফেলে। যদিও লুকোছাপার কিছু নেই। তারপরও বলা যায় না। হয়তো ষড়যন্ত্র করে কিছু একটা রেখে এসে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাল। তখন দু'আয়ে ইউনুস পড়তে থাকলাম। আল্লাহর দরবারে পানাহ চাইতে থাকলাম।

একজন প্রশ্ন করল:

– আচ্ছা হুজুর বলুন তো, বর্তমান সরকার তো মুসলমান, তারাও নামাজ রোজা করেন (?), কোরান পড়েন, হজ্জ করেন ইসলামের হেফাজত তো তাদেরও দায়িত্ব। শুধু আপনারাই কেন আন্দোলন করছেন?

– দেখুন, আমাদের তেরো দফায় আমরা কী বলেছি তাতো স্পষ্ট। আমরা কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনে যাইনি। সরকারের বিরুদ্ধে আমরা কোনো কথা বলিনি। আমরা আমাদের দাবি জানিয়েছি। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিয়েছি। আমরা কোনো দলের নই। এমনকি কোন ইসলামি দলের হয়েও আমরা কাজ করিনি। আমাদের দাবি ছিল- নবীজির বিরুদ্ধে যারা লিখেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যারা লিখেছে তাদের বিচার। সরকার যদি মুসলমান হন তাহলে তাদেরও দায়িত্ব এই আন্দোলনে বাধা না দেয়া। কিন্তু বাস্তবতা কি ? সেটা বলাই বাহুল্য।

– আপনারা যদি বিচারই চাইবেন তাহলে রাজিবকে মারলেন কেন?

– রাজিবকে আমরা মেরেছি কথাটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। এতে সত্যের লেশমাত্র নেই। তাকে কে মেরেছে সেটা কিন্তু এখনো প্রমাণ হয়নি। ভবিষ্যতে সত্য প্রকাশ পেলে বোঝা যাবে। আমি হলফ করে বলতে পারি, হেফাজতের কেউ তাকে মারেনি। যদিও সে আমাদের হৃদয়ের রক্ত ঝরিয়েছে। আমাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধার জায়গাটাতে সে লাথি মেরেছে।

– আপনি এত নিশ্চিত করে কীভাবে বলছেন? হেফাজতের মধ্যেও কি দুষ্ট লোক নেই?

– আমি আমার বিশ্বাস থেকে বলছি। আমি যা বিশ্বাস করি, আমাদের কওমী মাদরাসার সাথে যারা সম্পৃক্ত, সকলে তাই বিশ্বাস করে। আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা এক। পুরো বিশ্বে কওমী মাদরাসার শাখা আছে। আমরা এখানে বাংলাদেশে যা পড়ি, সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার মাদরাসাতেও একজন শিক্ষার্থী ঠিক তাই পড়ে। আমরা এখানে যেভাবে একজন ছাত্রকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি লন্ডনের একটা কওমী মাদরাসাতেও হুবহু সেভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

আপনি বলছেন, দুষ্ট লোক আছে কিনা? দুষ্ট লোক তো সব জায়গাতেই থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের হেফাজতের ব্যানারে যারা কাজ করছেন তাদের কেউই দুষ্ট নন। খোদার কসম!

– আচ্ছা এটাতো সত্য, জামাত-শিবির আপনাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। তারাই টাকা- পয়সা দিয়ে পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে।

– এর কোনো প্রমাণ নেই। এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। আমরা আন্দোলন করেছি সম্পূর্ণ আমাদের অন্তরের তাগিদ থেকে। কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে। নবীজির প্রতি ভালোবাসা থেকে। এর পেছনে টাকা-পয়সার কোনও ব্যাপার জড়িত নেই। আমাদের আন্দোলনে কোনো রাজনৈতিক দলের উপরি ফায়দা হওয়ার মানে এই নয় যে, আমরা তাদের সাথে হাত মিলিয়েছি। এটা কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

আর টাকা দিয়ে কি জীবন কেনা যায়? এই যে এতগুলো মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করে এত দূরদূরান্ত থেকে ঢাকার পানে ছুটে এসেছেন, তারা কি টাকার জন্য এসেছেন? টাকা দিয়ে কি এভাবে নিবেদিত প্রাণ মানুষ পাওয়া যায়?

এক ভাই অভিযোগ করেছেন, আমি টাকা পেয়েছি। আসুন, আমাদের মাদরাসার একাউন্ট চেক করুন। বড়জোর দুই হাজার টাকার বেশি জমা নেই। আমাদের খাওয়া- দাওয়া দেখুন, আমরা কত কষ্ট করে থাকি!

– আপনাদের মাদরাসাগুলো চলে কিভাবে?

– আমাদের মাদরাসাগুলো চলে মানুষের সাহায্য সহযোগিতায়।

– তাহলে মানুষের সাহায্য নিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন কেন?

– যাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি, তারা কখনো মাদরাসাকে সাহায্য করেনা। আর মানুষ মাদরাসায় সাহায্য করে ইসলামের জন্য। ধর্মের জন্য। আমাদের আন্দোলনওতো ইসলামের জন্য।

পরিবেশটা আস্তে আস্তে প্রশ্নোত্তর পর্বের রূপ ধারণ করছিল। শুরুতে যে রণহুংকার শোনা গিয়েছিল, যেভাবে মারমুখি ভঙ্গিতে জেরা-বচসা শুরু হয়েছিল, এই পর্যায়ে এসে সেটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু নেতাদের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তারা বিচারের এই রূপের সাথে একমত নয়। এতক্ষণের আলোচনায় আমার মনে হলো, এই বিচারসভায় দুইটা মানসিকতা কাজ করছে।

ঃ একদল চাচ্ছে একটা আপসমূলক সমাধান। এরা হলেন মুরুব্বির দল

ঃ আরেক দল চাচ্ছে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। এরা হলো সকালের নেতারা।

মনে মনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম। তিনি আমার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করে দিয়েছেন। আমি শুরু থেকেই চাচ্ছিলাম, আমার প্রতিপক্ষের মতামতের মধ্যে, তাদের চিন্তার জায়গাটাতে ফাটল ধরাতে। তাদের চিন্তাকে দুইভাগে বিভক্ত করতে। আল হামদুলিল্লাহ।

নেতা লোকটি যাকে উপরে পাঠিয়েছিল, সে ফিরে এসে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল। বলল:

– পাঁচতলায় দুইডা হেফাজত হুইয়া আছে। বুলেট খাইছে।

এবার অন্যরাও হৈ হৈ করে উঠল। আমি দেখলাম, যারা আমার বিচার করতে বসেছে, তাদের কেউ মাদরাসায় বিদ্যুতের ওয়ারিংয়ের কাজ করতো (মূল নেতাটি)। আর কেউ পাশের দোকানের কর্মচারি। আর কেউ গার্মেন্টসের শ্রমিক। এরা শিক্ষা-দীক্ষায় কেউই সম্পন্ন নয়। গত কয়েক বছরে এরা পায়ে হাঁটা থেকে বাইকে উঠেছে, এখন দেখি কেউ কেউ গাড়িও হাঁকায়। এত অল্প সময়ে এত অগ্রগতি?

মূল নেতা আবার দাবি জানাল:

– লিস্টিডা দিয়া দিতো কন।

সে মুরুব্বিদেরকে সম্বোধন করে বলল:

– আর উপরে যে হেফাজতরা আছে, তাদেরকে বাইর কইরা দিতো কন। আমরা হেরারে পুলিশে ধরাইয়া দিমু।

মুরুব্বিদের একজন আমার দিকে ফিরে বললেন:

– আপনি এদেরকে কেন এখানে রেখেছেন? এদেরকে এক্ষুণি বের করে দিন।

– এরা গুরুতর আহত। এদেরকে এই অবস্থায় বের করা সম্ভব নয়। এদের দুইজনের একজনের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। সে নড়াচড়াই করতে পারে না। আরেকজনের হাত-পা উভয়টাই ভাঙ্গা। আর এরা এতই গরীব যে, যাওয়ার জায়গা নেই। এদেরকে এই অবস্থায় বের করে দেয়ার অর্থ তাদের গলাটিপে হত্যা করা।

– আচ্ছা ঠিক আছে। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত থাকতে পারবে। এরপর আর থাকা চলবে না।

এতক্ষণ শান্তভাবে কথা বলে পরিস্থিতি যাওবা একটু অনুকূলে এসেছিল, আবার অবস্থা লাগাম ছাড়া হয়ে গেল। যারা কিছুটা নমনীয় হয়ে এসেছিলেন, তারা হয় আবার শক্ত হয়ে গেছেন, না হয় নমনীয়তা প্রকাশ করতে পারছেন না।

আমি মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলাম। মনে মনে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলাম। ওনারা নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন:

– মাদরাসাগুলোতে রাজনীতি ঢুকে গেছে। হুজুররা ইমামতি করতে গিয়েও রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। জুমার নামাজ পড়তে এসেও শান্তি নেই। খোতবা তো আরবিতে পড়ে। সেটাতেও নাকি ওরা রাজনীতির আলাপ করে।

আমি চুপচাপ রইলাম।

এই নেতাদের অবস্থা দেখে একবার মনে হলো, কৌশলপূর্ণ অবস্থান ছেড়ে চরম অবস্থানে চলে যাই। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল ফিলিস্তিনের কথা। আমাদের এই ভাইয়েরা কতটা মরিয়া হওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়? দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই তো এমন করে।

নেতাটি আবার ঘ্যানঘ্যান করে বলল:

– হুজুররে কন ট্যাহা কত পাইছে হিসাব দিতে। খরচবিরচ যা হইছে বাকীডা দিয়া দিতে। মুরুব্বীদের একজন বললেন:

– আসলেই কি টাকা পেয়েছেন? নাহলে এরা বারবার বলছে কেন?

– আমি যদি টাকা পেতাম, তাহলে আজকে এই বিচারে বসতে হতো না। টাকা দিয়ে সমাধান করে ফেলতে পারতাম। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি:

– এই আন্দোলনে কোনো রকমের টাকা-পয়সার ব্যাপার জড়িত নেই।

আসলেও তাই। সকালে যারা এসেছিল তারা পাঁচতলার দফতর থেকে বের হওয়ার পর, মাদরাসার বাইরে গিয়ে আরেক জনের সাথে টাকা নিয়ে আলাপ করেছে। টাকা দিলে যে রাতে বিচারে বসতে হবে না সেটাও আকারে- ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে। আমি মোটেই এ কথায় কান দেইনি। এদেরকে টাকা দেয়া মানে ঘুষ দেয়া। দ্বীনের কাজও ঘুষ দিয়ে করবো? আর এই লোভীরা একবার টাকার গন্ধ পেলে আর পিছু ছাড়বে?

রাত গভীর হয়ে যাচ্ছিল। এলাকার লোকেরা বলল:

– তাড়াতাড়ি বিচার শেষ কইরা দেন।

মূল নেতাটি আবার মোবাইল কানে দিয়ে বাইরে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে কার সাথে যেন উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করল। এরপর আরো দূরে গিয়ে কথা বলতে লাগল। অনেকক্ষণ তার আসার কোনো আলামত দেখা গেল না। নেতার ছোট ভাই তখনো বসা। সে আমাকে দেখিয়ে বলে উঠল:

– এই বড়ডারে ধইরা লইয়া গেলেই হইবো। আর কিছু লাগবো না।

মুরুব্বিদের একজন বললেন:

– তুই চুপ থাক। আমরা বিচার করছি। দেখি কী করা যায়। এবার দেখলাম, মুরুব্বিদের যারা এতক্ষণ একদম চুপ ছিলেন, শুধু শুনে যাচ্ছিলেন, তারা এবার মুখ খুলতে শুরু করেছেন। একজন বললেন:

– সভাপতি সাহেব! যা হওয়ার হয়ে গেছে। ছাত্ররা বুঝতে পারেনি এবারের মতো একটা ফয়সালা দিয়ে দিন। ভবিষ্যতে আর এমন হবে না, এই মর্মে একটা ওয়াদা নিয়ে নিন।

যিনি এই কথা বললেন, তিনি বিকেলে খবর পাঠিয়েছিলেন, আমি যেন বিচারে উপস্থিত থাকি। উনি এলাকার নেতাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসতে রাজি হচ্ছে না। বিচার তারা বসাবেই।

এই মুরুব্বির কথার খেই ধরে আরো কয়েক জন বলে উঠল:

– উনি যা বলছেন সেটা ঠিকই বলছেন। বিচার শেষ করে দিন।

সভাপতি সাহেব আমার দিকে ফিরে বললেন:

– হুজুর, আমাদের এলাকায় মাদরাসা থাকতে হলে, এলাকাবাসীর মতামতের বাইরে যাওয়া যাবে না। কোনো মিছিল-মিটিং, আন্দোলনে যাওয়া যাবে না। সরকারবিরোধী কর্মকান্ডে জড়ানো যাবে না। দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যক্রমে অংশ নেয়া যাবে না। এভাবে আরো দীর্ঘ তালিকা দিলেন।

আমি চুপচাপ শুনে গেলাম। আমার মতামত জানতে চাইলেন, আমি বললাম:

– ঠিক আছে।

এরপর আচমকাই শেষ হয়ে গেল এক ঘণ্টা বায়ান্ন মিনিটের এক অনিশ্চিত দীর্ঘ বিপদসংকুল যাত্রা। অনেক কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সব কথা তো খুঁটিনাটি মনে নেই। চরম কিছু হবে ধরেই মসজিদে এসেছিলাম। আল্লাহ যা চান সেটাই হয়। তিনি সর্বশক্তিমান।

নেতাটা সেই যে মোবাইল কানে লাগিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। এই নেতারা এখনো এলাকায় বাইক দাপিয়ে বেড়ায়। এদের দেখলেই শরীরের কোথাও যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। না না, ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রতি আমার কোনো হিংসা বা আক্রোশ নেই। এদেরকে দেখলে আমার ভেতরটা টগবগিয়ে ওঠে একথা ভেবে যে, এরা আমার নিরপরাধ ছেলেদের গায়ে হাত তুলেছে। নবীজির প্রতি ভালোবাসাকে অপমান করেছে। আমার মাদরাসার একজন উস্তাদের গালে প্রচন্ড জোরে চাপটাঘাত করেছে। গালে দাগ বসে ছিল অনেক দিন। আমার ছেলেরা শুধু মাদরাসার দিকে তাকিয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে যায়নি।
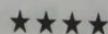
ফিরে দেখা

৫ তারিখের আগে, যখন এলাকায় এলাকায় প্রস্তুতিমূলক সভা হচ্ছিল, মিছিল হচ্ছিল; তখন আমাদের তিনজন তালিবে ইলমকেও মিছিল থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েও অনেক বেগ পোহাতে হয়েছিল।

সেদিন মাদরাসায় পাক্ষিক ছুটি ছিল। সবাই মাগরিবের পর পড়তে বসবে। ছুটি থাকাতে মাদারাসায় কে আছে, কে নেই সেটার হিসাব ছিল না। মাগরিবের পর হাজিরা নিতে গিয়ে দেখা গেল, তিনজন তালিবে ইলম নেই। সাথীরাও কিছু বলতে পারল না। বাড়িতে যোগাযোগ করা হল। বাড়িতেও যায়নি । এবার বাড়ির লোকজনও অস্থির হয়ে চারদিকে খোঁজখবর করতে লাগলো।

লালমাটিয়া মাদরাসার একজন খবর পাঠালো, আমাদের মাদরাসার তিনজন তালিবে ইলম অমুক থানায় আটক আছে। তখন অনেক রাত। ছেলেদের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেয়া হলো। নির্ঘুম রাত কাটল। সবার সাথে পরামর্শে বসলাম। সবাই বলল:

– ওদেরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য এখন থানায় যাওয়াটা প্রচন্ড ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা খবর পেয়েছি, ৫ তারিখের আগে যাদেরকে ধরা হচ্ছে, তাদের এখন আর ছাড়া হবে না। কেউ থানায় গেলেই আটক করা হচ্ছে। ওদের পরামর্শ মনঃপূত হলো না। তাই বলে কি ওরা জেলখানায় আটকা পড়ে থাকবে? ওরা হয়তো গতকাল দুপুর থেকেই কিছু খায়নি। আজ রাতেও বোধহয় অভূক্ত। আর বসে থাকা গেল না। একজনকে সঙ্গে নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে ফজরের আগেই মাদরাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম থানার উদ্দেশ্যে। বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ।

পথেই নামাজ পড়ে নিলাম। থানার সামনে রিকশা থেকে না নেমে একটু দূরে গিয়ে নামলাম। পকেটে টাকা-পয়সা যা ছিল সব ওকে দিলাম। মোবাইলটাও দিলাম। ওকে বললাম:

–দূর থেকে লক্ষ রাখ । আমার আসতে দেরি হলে, আমার অপেক্ষায় বসে না থেকে চলে যাবে।

কম্পিত পায়ে থানার মূল ফটকের সামনে দাঁড়ালাম। দুইজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। একজনের থুতনিতে সামান্য নূর। আমাকে জিজ্ঞাসা করল:

– কী হুজুর, কেন এসেছেন?

আমতা আমতা করে বললাম:

– আমাদের মাদরাসার দুইজন ছাত্র এখানে আছে বলে শুনেছি।

– কেন ধরা পড়েছে?

– গতকাল মিছিল থেকে তারা আটক হয়েছে।

– ও জামাতের লোক?

– না না, জামাতের লোক হবে কেন? ওরা আমাদের মাদরাসার ছাত্র। কওমী মাদরাসার ছাত্র।

– আপনারাওতো জামাতের লোক। সত্য না বলে মিথ্যা কেন বলছেন?

এবার শক্ত করে বললাম:

– জামাত আর কওমী মাদরাসা কখনোই এক ছিল না। ভবিষ্যতেও কখনো এক হবে বলে মনে হয় না।

তখন আমার সন্দেহ হলো, থুতনিতে সামান্য (ফ্রেঞ্চকাট) নূরওয়ালা লোকটা বোধ হয় নিজেই জামাত সমর্থক। নাহলে আমার উত্তরে পুলিশটা রেগে গেল কেন?

যাক কথা আর বাড়ল না। দুই পুলিশের একজন বলল:

– ভেতরে অফিসে গিয়ে খোঁজ নিন।

ভিতরে গিয়ে বসলাম। ডেস্কে কেউ নেই। আমার পাশের চেয়ারে দেখলাম একজন বসে বসে ঝিমুচ্ছে। পোশাক-আশাকে মাদরাসার কেউ বলেই মনে হলো। আমিও অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবার দেখি আরো একজন হুজুর এলেন। লালমাটিয়া মাদরাসা থেকে। বুকে বল পেলাম। যাক একা নই। এমন সময় ভেতর থেকে একজন কর্মকর্তা বের হলেন। তাকে আমাদের দুইজন ছাত্রের কথা বললাম। তিনি পূর্ণ ঠিকানা চাইলেন। ঠিকানা দিলাম। তিনি সব লিখে নিলেন। বললেন:

– বড় স্যার নেই। স্যার এলে দেখা যাবে।

– স্যার কখন আসবেন?

– নয়টার পর। স্যার ভালো মানুষ। তাই তাদেরকে গতকাল চালান দিয়ে দেননি। অন্য কেউ হলে আপনাদের সুদ্ধো হাজতে পুরে চালান দিয়ে দিতো।

আর অপেক্ষা করলাম না। মাদরাসায় চলে এলাম। যাক শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় তালিবে ইলমরা মাদরাসায় ফিরে এল।

সেই রাতে বিচার শেষ হওয়ার পর নেতারা ওঠে চলে গেল। এলাকার বেশ কয়েকজন মুরুব্বি তারপরো বসে আছেন। তাদেরকে দেখলাম অপরাধী অপরাধী ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। একজন এসে সরাসরি বলেই ফেললেন:

– হুজুর, কিছু মনে করবেন না। আমরা এক প্রকার বাধ্য হয়েই বিচারে বসেছি। বোঝেনইতো এলাকায় থাকি, তাল মিলিয়ে না চললে সুখে থাকতে দিবে না।

একজন বললেন:

– বিচার যাতে বেশিদূর না গড়ায় সেজন্য আমরা আগেই কয়েকজন মিলে পরামর্শ করে রেখেছিলাম।

পরে জানতে পেরেছি, নেতার সাথে যারা বিচারে এসেছিলো, তারা কিছু একটা করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো। বিচার মনের মতো না হলে তারা কিছু একটা করতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা চান সেটাই হয়।

এরপরও কয়েকদিন 'তারা' গলিতে পাহারা দিতে লাগল। আমরা দুই গুরুতর জখম তালিবে ইলমকে চিকিৎসার জন্য বাহিরে নিতে পারছিলাম না।

মাওলানা নুরুল ইসলাম ভাই খবর পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি বড় দরদী মানুষ। উম্মতের ফিকিরে সব সময় বে-চাইন থাকেন। দাওয়াতুল ঈমানের ময়দানে তিনি অত্যন্ত চৌকান্না। তিনি শুনেই একজন ডাক্তার পাঠালেন। অপরিচিত কাওকে মাদরাসায় ঢুকতে দেখলেই ওরা ধরছে। এখন ডাক্তার সাহেবকে মাদরাসায় আনা নিয়েও সমস্যা দেখা দিল। পরে ঠিক হলো, কোনো এক নামাজের সময় ওনাকে মাদরাসায় নিয়ে আসতে হবে। মুসল্লিগণের সাথে এসে নামাজ পড়ে, আহতদের দেখে, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে চলে যাবেন।

ডাক্তার সাহেব এলেন পরদিন। অর্থাৎ সাত তারিখে। এই দীর্ঘ সময় আহত ছেলেগুলো নিয়ে আমরা বিনিদ্র সময় কাটিয়েছি। গলির মধ্যে থাকা এক ঔষধ দোকানের কম্পাউন্ডার গোপনে এসে ব্যাথানাশক ইঞ্জেকশান পুশ করে দিয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা বলতে এইটুকুই। ছেলেগুলোর কষ্ট দেখে আমরা কেউই স্বস্তিতে থাকতে পারছিলাম না। মুখে খাবার রুচছিল না, চোখে ঘুম আসছিল না এবং কিতাবে মন বসছিল না।

উল্টোচিত্র

মাদরাসার সার্বিক ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে গেল। তালিবে ইলমরা লেখাপড়া এমনকি ইবাদত- বন্দেগি বাদ দিয়ে সারাক্ষণ ৫ তারিখের আলোচনায় মত্ত হয়ে রইল। আহত-নিহতের হিসাব কষায় ব্যতিব্যস্ত থাকল।

৫ তারিখের পরবর্তী কয়দিনে আমার উপলব্ধি হলো:

– তালিবে ইলমদেরকে লেখাপড়ার বাইরে অন্য কোনো কাজের সাথেই সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। লেখাপড়ার বাইরের কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার জন্য আলাদা কিছু লোক থাকবে। তারাই এই ময়দান দেখবে। অবশ্য প্রয়োজন দেখা দিলে সবারই নেমে পড়াটা অপরিহার্য।

পুরো বাংলাদেশ জুড়ে, কয়েক দিনের জন্য হেফাজত একটা বিপজ্জনক শব্দ হয়ে দাঁড়ালো। অনেক খতীব সাহেবের খিতাবাত চলে গেল। আমাদের মাদরাসা- মাসজিদেও তাই হলো। আমাদের মসজিদের খতীব ছিলেন মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব। অত্যন্ত ভালো মানুষ। ইলমদোস্ত কিতাবদোস্ত মানুষ। মুজাররাব-মুহান্নাক আলেম। তিনি কোনো ভনিতা না করেই, কোনো প্রকার কৌশলের আশ্রয় না নিয়েই, সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেলেন। কমিটির পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা হলো। তিনি হক কথা প্রকাশে পিছপা হলেন না। তাঁর বক্তব্য হল:

– এখন কৌশলের সময় নয়। এখন সম্মুখ সমরের সময়। আর চাকরি গেলে যাক। আমি কি চাকর-খতীব? চাকুরে হিসেবে তো আমি খতীব হতে আসিনি। এসেছি দ্বীনি দায়িত্ব নিয়ে। পরিণতি যা হবার তা-ই হলো। কিন্তু সব খতীব তো আর ওনার মতো হক পুরুস্ত নন। অনেকেই পরিস্থিতি মেনে

নিলেন। কমিটির কাছে পোষ মানলেন। এতো গেল মসজিদের কথা মাদরাসাগুলোও এর আওতা বহির্ভূত থাকল না। মাদরাসাগুলোর ওপর সাঁড়াশি অভিযান চলল। এই প্রথম কওমী মাদরাসাগুলো অস্তিত্ব-সংকটে ভুগলো। হক তো বিলীন হতে পারে না। আস্তে আস্তে সংকটজনক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল। হুজুরগণ আস্তে আস্তে বাইরে বেরোতে শুরু করলেন। তারপরও ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ এক শ্রেণীর মানুষের কাছে চরম অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হলেন। তারা আমাদের মাথার সেরতাজগণের নাম অতি ঘৃণাভরে উচ্চারণ করতে শুরু করল।

আমাদের অতি শ্রদ্ধার মানুষও একজন সাধারণ দলীয় সমর্থকের কাছে অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। একটি ছোট্ট ঘটনা তুলে ধরলেই বোঝা যাবে বলে মনে হয়:

৫ তারিখের কয়েক দিন আগে, বাড়ি থেকে ঢাকা আসছি। কুমিল্লা মুরাদনগরে এসে যানজটে পড়লাম। দুর্ভেদ্য সেই যানজট। দেখেই মনে হলো সহজে এই জট খুলবে না। যাত্রীরা সবাই নিজ নিজ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। হাঁটাহাঁটি করছে। হাত-পায়ের আড় ভাঙছে। হাই তুলছে। প্রকৃতির ডাক সাড়া দিচ্ছে। এমপি কায়কোবাদের এলাকা। সবার দেখাদেখি আমিও গাড়ি থেকে নামলাম। বাসের সামনে একটা জটলা দেখলাম। দেখলাম, তুমুল আলোচনা চলছে। বিষয় হেফাজত। একজনের গলা দেখলাম সবচেয়ে উঁচু হয়ে বারবার কানে আসছে। তার জবানিতে শোনা যাক:

-হেফাজত কেডা আবার? ইসলাম হেফাজত করবো তো আল্লাহ। তুই আকামা শফী (আল্লামা শফী দা: বা:) আবার কেডা রে? ইসলাম কি শুধু তুই মানস, আমরা ইসলাম মানি না? আমরা মুসলমান না?

হেরা ব্লগারগো ফাঁসি চায়। এই মোল্লারা ব্লগের কী ছইদ্দানা বোঝে? ব্লগ মানে হইল গিয়া ইন্টারনেটে লেহা। আকামা শফীডায় কি জানে, খোদাতালা নিজেই একজন ব্লগার? খোদাতালা (আল্লাহ তা'আলা) নিজেই প্রত্যেকটা মাইনষের কান্দে দুইজন কইরা ব্লগার বহাইয়া থুইছে।

কী কন মিয়া ভাই? কেরামান কাতিবিন, এই দুইজন ফেরেশতা তো মাইনষের কান্দে বইয়া বইয়া ব্লগিংই করতাছে। দুইজন কান্দে বইয়া বইয়া হমানে লেইখ্যা যাইতাছে, লেইখ্যা যাইতাছে। আল্লাহ ব্লগার, তার ফিরিশতারা ব্লগার। শফী কইলেই অইলো?

অন্যদের কথা কি বলবো, আমি নিজেই লোকটার অনর্গল বক্তব্য মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কিন্তু বড় ব্যথিত হলাম এভাবে উলামায়ে কেরামের প্রতি অবজ্ঞাসুলভ মনোভাবের পরিচয় পেয়ে। লোকটার আরেকটা কথা শোনে চমকে উঠলাম। একজন মুসলমান হয়ে কীভাবে এমন কথা মুখ দিয়ে বের করতে পারে?

লোকটি এবার হেফাজত আর ব্লগ ছেড়ে সরাসরি আল্লাহর কুদরতে হাত দিল। বলল:

-এই যে আমরা এই যানজটে আইটকা আছি, তার কারণ জানেন? কারণ হইল গিয়া, আল্লার (তা'আলা) কাছে ইয়ামোটা এক জাবদা খাতা আছে। হেইডাতে প্রত্যেকদিন দুইন্যায় কী কী কাম ওইবো তার একটা লিস্টি থাহে। নতুন কোনও কাম আইলে খাতায় লেইখ্যা লয়। আর পুরান কাম ওইলে টিক দিয়া চইল্যা যায়।

আবার বেশি কামের চাপ পইরা গেলে ফেরেশতারা হমানে টিক দিয়া চইল্যা যায়। তার মানে হইল, হুকুম আগের দিনেরটাই বহাল রইল।

আমরা যে আইটকা আছি, এইডাও বোধহয় ফেরেশতারা সময় না পাইয়া টিক দিয়া চইল্যা গেছে। নতুন কইরা কিছু লেহেটেহে নাইক্কা।

নাউজুবিল্লাহ!

আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি সরে আসলাম। বাসে ওঠে বসে রইলাম। সাথে থাকা বই পড়তে শুরু করলাম। এবার দেখি গাড়িতেও তুমুল আলোচনা। বিষয়? অবশ্যই হেফাজত। এক মেয়ে কথা বলছে। অনেক বিষয়েই কথা বলছে। আমি শুধু মাদরাসা সম্পর্কিত বক্তব্যটাই বলি। মেয়েটি বোধহয় ইউএনডিপির অধীনে চাকরি করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের নিয়ে গবেষণা করে। মেয়েটি বলল:

-আমি একবার অফিসের কাজে টেকনাফ গেলাম। কাজ সেরে হোটেলে ফিরছি। রিকশায় ছিলাম। আমার সামনে আরেকটা রিকশা। রিকশার পেছনে অনেক কিছু লেখা থাকে। সামনের রিকশায় অদ্ভুত এক স্লোগান লেখা। 'আপনার শিশুকে মাদরাসায় দিন'। আমি কোন দুনিয়াতে এসে পড়লাম। ছেলেকে মাদরাসায় দিয়ে কী হবে? সন্তানকে স্কুলে দেয়ার কথা লেখা থাকবে। মাদরাসার কথা কেন?

আমি আগের লোকের কথার ধাক্কাই সামলে উঠতে পারিনি। এই মেয়েটির কথা শুনে তো আরো আক্কেলগুড়ুম। আমাদের প্রতি, মাদরাসার প্রতি সমাজের একটি শ্রেণীর এত নীচ চিন্তা?

যেতে যেতে যেতে : ৩

আমরা লেখা শুরু করেছিলাম কুমিল্লার সফর নিয়ে। যেতে যেতে যেতে অন্যদিকে ঘুরে এলাম। আমাদের আগে থেকে ঠিক করা ছিল, আমরা আপাতত দুইজন শহীদের বাড়ি যাব। একজন মাওলানা মাহমুদুল হাসান কাসেমি (রহ.) এর বাড়িতে। আরেকজন মালিবাগের মাওলানা আনওয়ার শাহের বাড়িতে। দ্বিতীয়জনের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শহীদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.)- এর বাড়ি যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করাটা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শহীদ মাওলানার বাড়ি গিয়ে আমি জীবনের অন্যতম বড় কয়েকটি শিক্ষা লাভ করেছি। আর এটা সম্ভব হতো না মাওলানা রজীবুল হক সাহেবের সহৃদয় সাহায্য ছাড়া। তিনিই আগে বেড়ে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। এই খেদমতে শরীক করেছেন। তার সাথে থাকার সুযোগ দিয়েছেন।

শহীদ চত্বরের আশেকে রাসূলগণের খেদমতে অংশগ্রহণ করে কিছু বড় মনের মানুষের সাথেও পরিচয় হয়েছে। মাকতাবাতুল আজহারের মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব এমনই একজন। তিনি বড়ই আন্তরিকতার সাথে এই খেদমতে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাঁর এলাকায় হেফাজতের কাজ চালিয়ে গেছেন। ইখলাসের সাথে বিপদাপদকে তুচ্ছ করেছেন। যখনই তাঁর কাছে হাত পেতেছি, কাউকে পাঠিয়েছি। তিনি সাধ্যানুযায়ী খিদমাত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। আমিনী সাহেব হুজুরের (রহ.) ডাকে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। আর সাড়া দিবেন না কেন? তিনি তো জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের ফাযিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যবসায় উন্নতি দান করুন। তাঁকে একজন দ্বীনের দায়ী হিসেবে কবুল করুন। একজন স্নেহশীল পিতা হিসেবে কবুল করুন। তাঁর সন্তানদেরকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের জন্য কবূল করুন। আমীন!

আরেকজন মানুষের কথাও না বললেই নয়। বন্ধুবর মাওলানা সাইফুল আলম। সৌদি প্রবাসী। কিন্তু দ্বীনের জন্য, কওমী মাদরাসার জন্য,

ওলামায়ে কিরামের জন্য অত্যন্ত আন্তরিক। মনেপ্রাণে দরদী। তারও সহযোগিতার হাত প্রসারিত ছিল। সাধ্যানুযায়ী খেদমত করে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে, তার সন্তানদেরকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

আরো কয়েক জন প্রবাসী ভাইবোনের কথা তো কিছুতেই ভোলার নয়। তারা যে আবেগ-ভালোবাসা দেখিয়েছেন, এই কাজে যে প্রেরণা যুগিয়েছেন তার কোনো সীমা নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নেক সন্তানের পিতামাতা হওয়ার তাওফীক দান করুন।

কুমিল্লা রওয়ানা দেয়ার আগের দিন, রজীবুল হক সাহেব পইপই করে বলে দিয়েছেন, আমরা যেভাবেই হোক ফজরের নামাজ ঢাকার বাইরে গিয়ে পড়বো। আমরা তিনটার মধ্যেই বের হওয়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলবো। আমি বললাম:-

- আমি তৈরী থাকবো। হুজুর ফোন করলেই আমি মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসবো।

- আমি গাড়ি নিয়ে মাদরাসার কাছাকাছি এসে ফোন করবো।

- জ্বি ঠিক আছে।

রাতেই সব গোছগাছ করা ছিল। প্রতিদিনের নিয়ম হিসেবেই তিনটায় উঠলাম। সবকিছু সেরে পড়তে বসলাম। রাজীব সাহেব হুজুর ফোন করলেন ভোর চারটায়।

যাত্রাবাড়ি পৌছতেই ফজরের আজান হয়ে গেল। এক পেট্রোল পাম্পে তেল নেয়ার জন্য গাড়ি দাঁড়ালো। আমরা নামাজ পড়ে নিলাম।

শহীদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) দেওবন্দের ফারিগ। তিনি সবসময়ই শাহাদাতের তামান্না ভেতরে লালন করতেন। নারায়ণগঞ্জের এক মাদরাসায় খিদমতে ছিলেন। তার আগে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। টুকটাক ব্যবসা করতেন। তিনি দাওয়াতে তাবলীগে এক সাল লাগানো মজবুত সাথী। আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী মেহনতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। এবং সেই চেতনা দেশে ফিরে এসেও তিনি বুকের মধ্যে লালন করতেন।

৫ তারিখের আগে, বাড়ি থেকে আসার সময় সহধর্মিণী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলেন। যেন তার জানা হয়ে গিয়েছিল। প্রভুর ডাক তিনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। বিবি সাহেবাকে বলেছিলেন:

– ওগো! আর যদি দেখা না হয় মাফ করে দিও। আখেরাতে দেখা হবে।

তিনি ব্যবসার মানুষ ছিলেন না। তা'লীম ও তাবলীগের মানুষ ছিলেন। তাই ব্যবসাটা সুবিধের হলো না। ধারদেনার পরিমাণ এত বেশি হলো যে, শেষ পর্যন্ত বসতভিটা বন্ধক রেখে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়েছিল।

তিনি ৫ তারিখ পল্টনে গুলি খেয়েছেন। অকুস্থলেই শাহাদাত লাভ করেছেন। তার (অ)মরদেহ বহন করে শহীদ চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ছবি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমেও এসেছিল। কিন্তু কোনো পরিচয় দেয়া ছিল না। তার চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না, তিনি জীবিত না মৃত। অত্যন্ত তাজা আর সজীব ছিল তার দেহ। মুখে ছিল স্মিত হাসি। তার লাশ পরদিন গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে, চিটাগাং রোডে একদল 'লোক' বাধা দিল। লাশ নেয়া যাবে না। এম্বুলেন্স ফিরিয়ে দেয়া হলো। পরে তাঁকে নুরিয়া মাদরাসায় দাফন করা হয়েছে।

এক অব্যক্ত বেদনার আখ্যান

সেদিন পল্টনে, শহীদ মাওলানার কিছুক্ষণ আগে, আরেক ভাই গুরুতর আহত হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ বশীর। ভোলার মানুষ। নবীজির টানে ছুটে এসেছিলেন। এই ভাইও দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। ভাইটির মুখেই বিবরণ শোনা যাক:

– আমি কাঁটাবনের এক মালিকের গাড়ি চালাতাম। ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি। কয়েকদিন থাকব। এর মধ্যে শুনলাম, আমাদের এলাকার কয়েকজন ঢাকা যাবে। আমি বললাম, আমিও তোমাদের সাথে যাবো। বাড়িতে বাচ্চারা তিনজন। তিন ছেলে। বৃদ্ধ বাবা-মা। বিবি বলল:

- এতদিন পর এলেন। পুরো ছুটি না কাটিয়েই চলে যাচ্ছেন?

- পরের বার আসলে থাকব। তুমি মনে কষ্ট নিও না। সবাই নবীজির টানে যাচ্ছে, আমি যদি না যাই মনে দু:খ থেকে যাবে। তুমি খুশি মনে বিদায় দাও।

ঢাকা এলাম। আমি থাকতাম হাজারিবাগের সেকশনের দিকে। ঘটনার দিন আমরা লালবাগে এসে মিছিলে যোগ দিলাম। মিছিল আস্তে আস্তে

পল্টনের দিকে আগাচ্ছিল। পুরানা পল্টন আসার পরই দেখলাম, একটা পুলিশের গাড়ি জ্বলছে। চৌরাস্তায় পুলিশ ব্যরিকেড দিয়ে রেখেছে।

আমরা ব্যরিকেড পার হওয়ার চেষ্টা করলাম। পুলিশ দৌড়ান দিল। গুলিও করল। আমাদের পাশেই একজন হুজুর দৌড়াচ্ছিলেন। তাকে দেখলাম গুলি খেয়ে পড়ে যেতে। আমরা কয়েকজন তাকে ধরাধরি করে অন্য দিকে নিয়ে গেলাম। আমরা একটা গলিতে ঢুকে গেলাম। আরেক পাশে একটি এম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে ছিল। হুজুরকে সেটাতে তুলে দিলাম। কতক্ষণ পর আবার বের হয়ে এলাম। গলির মুখে দেখি ধোঁয়ার পর্দা। এত ঘন ধোঁয়া ওপাশে কী আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা কয়েক জন লাফ দিয়ে ধোঁয়ার কুন্ডুলি পার হলাম।

ধোঁয়ার স্তর পার হওয়ার পরই দেখি একদল লোক হকিস্টিক আর লাঠিসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাদেরকে দেখে দৌড়ান দিল। আমার সাথে যারা ছিল, তারাও দৌড় দিল। আমিও দৌড় শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তায় পড়ে থাকা কলার খোসায় পা পিছলে উল্টে পড়ে গেলাম। ওরা এসে আমাকে ধরে ফেলল। কয়েকজন আমাকে জাপটে ধরে পিটাতে লাগল। এভাবে পিটাতে পিটাতে পুলিশের সামনে দিয়েই আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলল। পুলিশ ভাইরা দেখেও কিছু বলল না।

এক জায়গায় গিয়ে ওরা থামল। আমাকে রাস্তার উপর দাঁড় করাল। প্রশ্ন করল:

– কেন এসেছিস?

– আমি দেখতে এসেছি।

– বাড়ি কোথায়?

– ভোলা।

– ঢাকায় কি করিস?

– প্রাইভেট চালাই।

– হেফাজত তোকে কত টাকা দিয়েছে?

– আমি হেফাজতের কাউকে চিনি না। আর টাকা-পয়সাও কেউ আমাকে দেয়নি। আমি আর আমার কয়েক জন বন্ধু মিলে এখানে কী হচ্ছে দেখতে এসেছি।

এরপর পল্টনের দিক থেকে একজন হেলমেট পরা লোক আমাদের দিকে দৌড়ে এল। সে পুলিশের লোক না। লোকটা দৌড়ে এসেই আমার বুকে লাথি মারল। আমি পড়ে গেলাম। ওঠে বসতে বলল। ওঠে বসলে আরেকজন ঘুষি মারল। ওঠে দাঁড়াতে বলল। আমি ওঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ওরা জোর করে দাঁড় করালো। এরপর সবাই মিলে আমাকে লাঠি আর হকিস্টিক দিয়ে বেধড়ক পেটাতে লাগল। পেটাতে পেটাতে আমার গায়ের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর আমি দাঁড়ানো থেকে পড়ে গেলাম।

পুরো শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। লাঠির আঘাত হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম। শুধু যখন হাড্ডিতে বাড়ি পড়ছিল তখন ব্যথা পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর, প্রায় আধাঘণ্টা পর, ওরা পিটানো বন্ধ করল। একজন বলল এই ওঠে দাঁড়া। আমি চেষ্টা করেও পারলাম না। ওরা আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। ওরা আমাকে ছেড়ে দিলে আমি ঘুরে পড়ে গেলাম।

ওরা আবার আমাকে ধরে দাঁড় করালো। একজন বলল:

– যা চলে যা।

আমি হাঁটতে পারছিলাম না। এরমধ্যে একজন এসে জোরে আমার ডানপায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করল। আমি পড়ে গেলাম। ওরা আবার আমাকে দাঁড় করালো। ওরা ছেড়ে দিতেই আমি ধড়াস করে পড়ে গেলাম। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই দেখি, ডানপাটা গোড়ালির কাছে ভেঙ্গে গেছে। একটা ভাঙ্গা হাড় চামড়া ছিঁড়ে বের হয়ে রাস্তার কংক্রিটের সাথে ঘষা খেল। তখন পুরো শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল।

এই অবস্থায়ও ওরা আমাকে বলল উঠে দাঁড়াতে। আমি তখনো বুঝতে পারিনি, আমার একটা পা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে। আমি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়লাম। আমি উঠছি না দেখে চারজন আমার দিকে এগিয়ে আসল। দুইজন আমার দুই হাত চেপে ধরল। আর দুইজন চেপে ধরল আমার দুই পা। আরেক জন এসে আমার ভাঙ্গা গোড়ালি ধরে মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলল। গোড়ালিটাকে ভেঙ্গে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল। গোড়ালিটা চামড়ার সাথে ঝুলছিল। আমি এর মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

আমি মরে গেছি ভেবে পাশের নর্দমায় ফেলে দিয়ে ওরা চলে গেল। আমার সাথে যারা দৌড়াচ্ছিল ওরা ফিরে এসে দূর থেকে আমাকে পেটাতে দেখছিল। ভয়ে আগাতে পারছিল না। এখন আমাকে একা নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখে ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসল। আমাকে ধরাধরি করে

ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার পুরো শরীরের কাটাছেঁড়া সেলাই করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। ভেঙ্গে যাওয়া পা'টাকে চামড়া দিয়ে সেলাই করে কোনো রকম জোড়া লাগিয়ে দিলেন।

আমি বাসায় পড়ে থাকলাম। ভালো চিকিৎসা করাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা তো দূরের কথা, ঘরে খাওয়ার চালও নেই। বাড়িতে তো সবাই গরীব। আমার এক ভাই মাওলানা। সে বলল:

- সাভারের এনাম মেডিকেলে যোগাযোগ করতে। সেখানে গেলাম। সামান্য টাকায় আর কতটুকুই বা চিকিৎসা করা যায়।

এরপর বাড়ি ফিরে গেলাম। ভোলায়। কেনো চিকিৎসা নেই। পায়ে পচন ধরে গেল। আস্তে আস্তে পা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করল। এলাকাবাসীরা কেউ এগিয়ে আসল না। অনেকে হেফাজত বলে গালি দিতে লাগল। কেউ কেউ বলল:

– যাদের টাকা খেয়ে ঢাকা গিয়েছ, তাদেরকে বল চিকিৎসা করাতে।

প্রায় বিশদিন পার হয়ে গেল। ঘরে বৃদ্ধা বাবা- মা সারাক্ষণ কাঁদতে লাগলেন। তিনটা ছোট ছোট বাচ্চার কী হবে এই চিন্তায় সবাই অস্থির হয়ে গেল। বিবি সাব সারাদিন পাগলের মতো ভাবতে থাকে। আশপাশের লোকেরা ধরে নিয়েছিল, এভাবেই আমার জীবন পঙ্গু হয়ে কেটে যাবে। আমিও কোনও আশা দেখছিলাম না। তারপরও মনে মনে আল্লাহর কাছে দু'আ করে যাচ্ছিলাম। তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেন।

আমরা এরপরের ঘটনা রজীব সাহেব হুজুরের মুখে শুনি:

আমি ভোলায় আগে চিল্লা দিয়েছিলাম। ভোলার বিভিন্ন এলাকা ভালোভাবে চেনা আছে। এবার গেলাম ৫ তারিখের এক শহীদ ভাইয়ের পরিবারের হালপুরচি করার জন্য। এই ভাইয়ের নাম শহীদ আকবর। বয়স বাইশ বা তেইশ। গুলিস্তানে টেইলার্সের কাজ করতেন। এই ভাইয়ের বাবা গ্রামের মসজিদের মুয়াজ্জিন। এই শোকাহত পরিবারের সাধ্যানুযায়ী ইকরাম করার চেষ্টা করলাম, এবং এলাকার সবাইকে নিয়ে শহীদ ভাইয়ের কবর যিয়ারত করলাম। ওখানে গিয়েই পরিচিত সবাইকে বললাম, আশেপাশে খোঁজ নিয়ে দেখুন কোনো আহত বা শহীদ ভাই আছেন কিনা। খোঁজ করতে করতে ভাই বশীরের খোঁজ পেলাম। তার বাড়ি ভোলা শহর থেকে একশত দশ কিলোমিটার দূরে। আমার ঢাকা চলে আসার সময় হয়ে

গিয়েছিল। বশীরের পিতার সাথে কথা বললাম। জানতে চাইলাম, ওনারা কি আর্থিক সাহায্য চান নাকি চিকিৎসা চান।

বাড়িতে গিয়ে পরামর্শ করে জানাতে বললাম। আমি আসার সময় তিন হাজার টাকা দিয়ে আসলাম। ঢাকা আসার ভাড়া বাবদ। ওনারা পারিবারিকভাবে চিকিৎসা করাটাকেই বেছে নিলেন। ভাই বশীর ঢাকা এল। আমরা কল্যাণপুরের ইবনে সীনায় ভর্তি করিয়ে দিলাম। আগেই ডাক্তারের সাথে কথা বলে রেখেছিলাম। ডাক্তার সাহেব বড় সহৃদয় ব্যক্তি। হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য একটি বেড নির্ধারণ করা থাকে। তারা সেটাতে নিজেদের পরিচিত রোগিকে রাখতে পারেন। ইনিও ভাই বশীরকে যতদিন চিকিৎসা চলল, কোনো বিনিময় ছাড়াই থাকতে দিলেন। আমরা যতজনের চিকিৎসার মাধ্যমে খেদমত করেছি, সবচে বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে ভাই বশীরের জন্য। একদম অচল হয়ে যাওয়া একটা পা ঠিক করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানিতে এটা সম্ভব হয়েছে।

ভাই বশীর বলল:

– ইবনে সীনায় চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেলাম। বাড়ি যাওয়ার সময় রজীব সাহেব হুজুর পুরো পরিবারের জন্য বাজার করে দিলেন। আব্বা-আম্মার জন্য শাড়ী-লুঙ্গী। বিবি সাহেবার জন্য থ্রি পিচ, শাড়ী। তিনটি বাবুর জন্য জামা- কাপড়। এমনকি বাথরুমের জন্য টিস্যু কাগজ পর্যন্ত কিনে দিলেন।

রজীব সাহেব হুজুর বললেন:

– আমি এর আগে কখনো শাড়ী কিনিনি। বাড়িতে সবসময় সেলাওয়ার-কামীস পরে। এই ভাইয়ের ঘরের জন্যই জীবনের প্রথম শাড়ী কিনলাম।

ভাই বশীর বললেন:

– বাড়ির সবাই এসব পেয়ে কী যে খুশি হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। গ্রামের সবাই বলাবলি করতে লাগল, এই হুজুর অনেক বড় মানুষ। অনেক ভালো মানুষ। না হলে এত টাকা খরচ করে চিকিৎসা করালো, এরপর আবার এক মাস চলার মতো সংসারের চাল ডাল থেকে শুরু করে সব বাজার করে দিল।

ভাই বশীর এসব বলে হাউমাউ করে কেঁদে দিল। আমারও চোখ ঝাপসা হয়ে গেলো। সে বলল:

– আমি কল্পনাও করতে পারিনি, আবার হাঁটতে পারব। গাড়ী চালাতে পারব। বাড়ির বাইরে বের হতে পারব। ঢাকায় আসতে পারব। আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, আমার বাকী জীবনটা হয় ভিক্ষা করে নাহয় বসার কোনো কাজ করে কাটাতে হবে। গ্রামের লোকেরাও ধরে নিয়েছিল, আমি আর হাঁটতে পারব না। এখন যখন আমি বাজারে যাই, সবাই আমাকে ঘিরে ধরে। সবাই জানতে চায়, এটা কীভাবে সম্ভব হলো। কে এই সহযোগিতা করলো।

যতদিন আমি চিকিৎসাধীন ছিলাম, আমি জামাই আদরে ছিলাম। রজীব সাহেব হুজুর কিছুই বুঝতে দেননি। কোনো অভাব অনুভব করতে দেননি। হুজুরদের মধ্যে এমন ভাল মানুষ থাকতে পারে আমার কল্পনায়ও ছিল না। হুজুর আমার কে? কেউ না। আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার জন্য কিছুই করেনি। আমি বিশ দিন ঘরে পড়েছিলাম। কেউ একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি। একটু সমবেদনা জানায়নি।

ভাই বশীর এখন বলতে গেলে পুরোপুরি সুস্থ। প্রথম প্রথম হাঁটার সময় একটু খোঁড়াতেন। তার বিশ্বাস ছিল, এই সামান্য সমস্যাও আস্তে আস্তে কেটে যাবে। রাব্বে কারীমের অপূর্ব মহিমা, এই গাজি ভাইটি এখন একটুও না খুঁড়িয়ে সুস্থ-সবল মানুষের মতো হাঁটেন। রজীব সাহেব হুজুর একদিন জোহরের পরে তাকে নিয়ে মাদরাসায় এসেছিলেন। ভাই বশীরেরও আমাদের মাদরাসা দেখার খুব আগ্রহ ছিল। সে দীর্ঘদিন ইবনে সীনায় ছিল। আমরা নিয়মিত তার জন্য তিন বেলা খাবার পাঠিয়েছি। তার সাথে পরিবারের অন্যরাও ছিলো। এতজনের খাবার পাঠানো আমাদের জন্য অনেক কষ্টের ছিলো। আল্লাহই তাওফীক দিয়েছেন। ছেলেরা অনেক পরিশ্রম করে হেঁটে হেঁটে খাবার নিয়ে যেতো। অত দূর হেঁটে যেতে যেতে তারা ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে চুপসে যেতো। সেটা হাসপাতালের অনেকেরই নজর এড়াত না।

রজীব সাহেব হুজুর ভাই বশীরকে আজ এক জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে নিয়ে গেলেন। অনেক দিন পর আজ গাড়ী চালাতে গিয়ে হাত-পা কাঁপছিল। তারপরও চাকরি হয়ে গেল।

ছোট্ট একটা ভাবনা

আমি ভেবে দেখলাম, মানুষের সেবা করলে, মানুষের জন্য কিছু করলে মানুষও আমাদের জন্য কিছু করবে। এখন কথা হলো আমাদের দায়িত্ব কি শুধু হিদায়াত বিতরণ করা নাকি পাশাপাশি সুখ-সাহায্য বিতরণ করাটাও জরুরি? প্রশ্নটা কি খুবই জটিল হয়ে গেল? আল্লাহই জানেন। আমার মনে হয়, আমাদেরকে শুধু হিদায়াত বিলালেই চলবে না, পাশাপাশি আরো কিছু করা দরকার। আমাদেরকে শুধু আখেরাতের অনন্ত সুখের পথের সন্ধান দিলেই হবে না, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের সন্ধান দেয়াটাও জরুরী। অন্তত কিছুটা হলেও। আবার তার মানে এই নয় যে, আমরা সব ছেড়েছুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো।

খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ভ্রান্ত ধর্ম সেবার মোড়কে মানুষকে গেলায়। আর আমরা সঠিক ধর্মকে সেবার মোড়কে উপস্থাপন করলে দোষ কোথায়। ভাই বশীরকে দেখলাম, সে কথায় কথায় কৃতজ্ঞতায় কেঁদে দিচ্ছে। রজীব সাহেব হুজুরের প্রতি নিজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করছে। বারবার চোখের পানি মুছছে। আগে টুপি দাড়ি ছিল না। এখন পাঁচওয়াক্ত নামাজি। সে বলেছিল, আমি হেফাজতে আসতে পেরে গর্বিত। আহত হয়ে গর্বিত। এলাকায় একবার এক জায়গায় জোরে জোরে কথা বলছিলাম। তখন কিছু যুবক ধমক দিয়ে বলল:

– এই আস্তে কথা বল।

আমি তাদেরকে উত্তর দিয়েছি:

– কেন, আস্তে কথা বলব কেন?

আমার উত্তর শোনে তারা হেফাজত বলে গালি দিয়ে তেড়ে আসল। আমিও রুখে দাঁড়িয়েছি। তারা পরে সরে গেছে। একবার তো নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছি। এখন আর মৃত্যুর ভয় করি না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় পাই না।

আমরা দুপুরে তিনজনে একসাথে খাবার খেলাম। ভাই বশীরের সঙ্গ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। অনেক নতুন ভাবনা দিয়েছে। তার সহজ-সরল আচরণ আমাকে চমৎকৃত করেছে। প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা সে তার কথা একনাগাড়ে বলে গেছে। সে তার ভাষায় বলেছে। দেখলাম সে খুব

গুছিয়ে কথা বলতে পারে। কথার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বর্ণনা করতে পারে। কোথায় কোন ভঙ্গিতে কথা বলতে হবে, তা জানে। একজন অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এসব দুর্লভ গুণ কীভাবে সন্নিবেশ ঘটল?

কুমিল্লার পথে

ফজরের নামাজ পড়ে আবার রওয়ানা দিলাম। আমরা মোট ছিলাম পাঁচ জন। চালক ভাইসহ। রজীবুল হক সাহেব। আমি, জামি'আ রাহমানিয়ার মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ। মিরপুরের ইমরান হুসাইন।

আমরা মিরপুর গিয়ে মুসলিম বাজার মাদরাসার ইমরানকে উঠিয়ে নিয়েছি। আর পথে আসাদ গেট থেকে উঠেছে জামি'আ রাহমানিয়ার আসাদ।

ইমরান এর আগেও রজীব সাহেব হুজুরের সাথে ঢাকার বাইরে গিয়েছে। সে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে শহীদ চত্বরে শরীক হয়েছে। জাতীয় পতাকা দিয়ে জামা বানিয়ে গায়ে দিয়ে গেছে। আবেগে উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। টগবগ করছে। এখন তার আত্মীয়-স্বজনদের থেকে সাহায্য-সহযোগিতা সংগ্রহ করে, শহীদ ও আহতদের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

তার আব্বু-আম্মুও ছেলের আবেগ-উৎসাহে বাধা দেননি। রজীব সাহেব হুজুরের সাথে বাংলাদেশের এমাথা- ওমাথা চষে বেড়িয়েছে। সাহায্য নিয়ে গেছে। আজ ফরিদপুর এক শহীদের বাড়ি তো কাল বরিশালে আরেক শহীদের বাড়ি। এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে। দিবানিশি-অহর্নিশি।

তার আব্বু-আম্মুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মে গেল। ধন্য এমন পিতামাতা। সে যে কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, সেটা খুবই বিপদসংকুল ছিল। পদে পদে বাধা ছিল। চোখ রাঙানি ছিল।

রজীব সাহেব হুজুর বলেছেন:

– আমাদের এভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাহায্য নিয়ে যাওয়া অনেকেরই পছন্দ ছিল না। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রবল চাপ ছিল। যে কোনো সময় গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা যখন এই খেদমত শুরু করেছিলাম, প্রথম প্রথম কাউকে পাশে পাইনি। সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার ওপর

তাওয়াক্কুল করে এ কাজে নেমেছিলাম। সবাই তখন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য নিজ নিজ জায়গা থেকে সরে আছেন।

এত বড় একটা আন্দোলন ও জমায়েতের পরবর্তী কিছু কাজ থাকে, সেগুলো আগে থেকেই সেরে রাখতে হয়। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এমন কেনো ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমি শহীদ ও আহতদের খিদমাতে নেমে এক অকুল পাথারে পড়লাম। কোন পথে অগ্রসর হব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অসংখ্য আহত ভাই বিভিন্ন হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছেন, হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। আমি একা কয়দিক সামলাই?

আলহামদুলিল্লাহ, পরবর্তীকালে অনেকেই আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছেন। ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু যৌথভাবে এই কাজটা হলে কি আরো ভালো হতো না? দেখা গেল, আমি একজনকে টাকা দিয়ে এসেছি, পরে গিয়ে শুনি অন্য আরেক ভাই গিয়েও তাকে টাকা দিয়েছে। আবার দেখা গেল, এককোণে পড়ে থাকা একজন গুরুতর আহত ভাই কোনো কিছুই পেল না।

এভাবে সমন্বয়হীন কাজে কোনো বরকত থাকে না। আমরা একসাথে কাজ করতে পারি না। আমরা অন্যের অধীনে কাজ করতে পারি না। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। আবার সঠিক নেতৃত্বও দিতে পারি না। নেতৃত্বের সার্বিক দায়দায়িত্বও নিতে চাই না। আমরা সমন্বয়ের সাথে কাজ করতে পারলে আমাদের অনেক ভাইয়ের একটি হাত বেঁচে যেতো। অনেক ভাইয়ের একটি পা বেঁচে যেতো। কোনো ভাইয়ের একটি চোখ অন্তত বাঁচানো যেতো। সব কিছু আল্লাহ তা'আলার ইশারা আর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু তাই বলে নিজেদের দায় তো এড়াতে পারি না।

গাড়িতে বসে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললাম। ইমরানের দেখলাম নানা বিষয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ। অনেক অভিযোগ। তার মতো বয়সে এসব অভিযোগ স্বাভাবিক। তারপরও তাকে কয়েকটা বিষয় ধরিয়ে দিলাম। যে বিষয়গুলো তার বয়সের অগভীরতার কারণে তার চোখে ভিন্ন রকম ঠেকছিল। ইমরান অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করছিল তার অবস্থান থেকে। তার বয়স দিয়ে। মুরুব্বিগণ অনেক সিদ্ধান্ত নেন সুদূর ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে। অতীতের অনেক ঘটনার অভিজ্ঞতার আলোকে। তরুণদের সামনে

অতীতও থাকে না আবার ভবিষ্যতও থাকে না। তরুণদের সামনে থাকে জ্বলজ্বলে বর্তমান।

আরেকটা বিষয় আমাদের সবসময় মনে রাখতে হয়। আমরা মাদরাসা ঘরানায় যারা থাকি, তারা সাধারণত সরাসরি সমালোচনা পছন্দ করি না। খোলাখুলি সমালোচনাকে প্রশ্রয় দিই না। উদ্ধত সমালোচককে এড়িয়ে চলি। অতীতে যারা কওমী মাদরাসা ও মুরুব্বিদের সমালোচনা করেছে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিতাড়িত হয়েছে। তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিতর্কিত হয়েছে। তারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করেছে।

যারা কওমী মাদরাসার কল্যাণ চায়, তাদের উচিত 'সমালোচনার ভঙ্গি' পরিহার করে, 'মুশাওয়ারার ভঙ্গি' অবলম্বন করা। 'রাগের ভঙ্গি' পরিহার করে 'ভালোবাসার ভঙ্গি' অবলম্বন করা। কওমী মাদরাসার উন্নতি করতে গিয়ে শত্রুতা করে ফেলে অনেকেই। আমাদের মনে রাখা উচিত, সমালোচনা না করে, আমি কী ভাবি, আমি কী চাই, সে অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া। পুরো মাদরাসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

নবীন আর প্রবীণের সমন্বয়েই সমাজ এগিয়ে যায়। সমাজ শুধু প্রবীরে অভিজ্ঞতার ঝুলির মুখাপেক্ষিই নয়; তরুণের দ্যুতিময় গতিও সমাজের প্রয়োজন। একটাকে ছাড়া অন্যটা অচল আর বিকল। ইমরান বা তার মতো অনেকের মনেই হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সেসব প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। আবার এসব প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ে থাকাও স্বাভাবিক মানসিকতার পরিচায়ক নয়।

গাড়িতে বসে রজীব সাহেব হুজুরের সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছিল। হুজুর স্বভাবগত বিনয়ের সাথে কথা বলছিলেন। আমার আবার গাড়িতে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আর আকাশ কুসুম কল্পনা করতে ইচ্ছা করে ।

আমাদের সাথে থাকা মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ হলো আজকের রাহবার। সে ভদ্র নম্র ছেলে। ইমরানও ভদ্র। আসাদ গাড়িতে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। আমরা শহীদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) সম্পর্কে আসাদের কাছে নানা বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম। আসাদ আমাদের শহীদ মুজাহিদকে পূর্ব থেকেই চিনত। কতক্ষণ পরপরই শহীদ মাওলানার বাড়ি থেকে আসাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছিল। আসাদও কিছুক্ষণ পরপর আমাদের অগ্রগতি

জানিয়ে দিচ্ছিল। শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম। এমন শোকের মধ্যেও মেহমানের প্রতি দায়দায়িত্বে বিন্দুমাত্র অবহেলা নেই।

বাইরের বাতাস আরামদায়ক। কতক্ষণ পরই সূর্য তেতে উঠলে আবহাওয়া বদলে যাবে। এর আগেই যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। রজীব সাহেব হুজুর বললেন:

পথে ভালো কোনো খাবারের হোটেল চোখে পড়লে বলবেন। আমরা আবার আলাপে ডুবে গেলাম। ৫ তারিখের কারগুজারি মুজাকারা শুরু হল। নানা দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ চলল। কিছু বিষয়ে পরস্পরে মতপার্থক্যও দেখা দিল। যুক্তি পাল্টা- যুক্তি চলল।

সামনে কুমিল্লা বিশ্বরোড। সেখান থেকে আরেক জন মাওলানা উঠবেন। মাওলানা যাকারিয়া সাহেব। তিনিই মূল রাহবার। তার বাড়ি শহীদ মরহুমের বাড়ির পাশেই। মাওলানা যাকারিয়া রাজাপুর মাদরাসার উস্তাদ। এই মাদরাসাতেই শহীদ মাওলানার তিন ছেলে বর্তমানে পড়াশোনা করছে।

গাড়ি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট পার হলো। আসাদ ফোনে মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সাথে যোগাযোগ করল। তিনি বিশ্বরোডে আমাদের জন্য অপেক্ষমান। আমরা গাড়ি থেকে নেমে এক হোটেলে বসলাম। হালকা নাশতা সেরে নিলাম। লম্বা পথচলা। তাই ভারি কিছু খেতে ইচ্ছে হলো না। আমরা জুমু'আর নামাজ ঢাকা গিয়েই পড়ব, এমন সিদ্ধান্ত। যাওয়ার পথে আসাদের বাড়িতে দুপুরের খাবারের দাওয়াত।

মাওলানা যাকারিয়া সাহেব গাড়িতে উঠলেন। পাগড়ি-জুব্বা পরিহিত পুরোদস্তুর হুজুর। শ্মশ্রুমণ্ডিত গোলগাল মুখাবয়ব। চোখের চাহনিতে ধারালোভাব আছে। তার মানে ভেতরে 'ভাব-মা'না ধারণ করেন। চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। গাড়িতে বসে বেশি কথা বললেন না বা বলতে চাইলেন না। ইমরান অনেক বিষয়ে তার ক্ষোভ তখনো প্রকাশ করছিল। যাকারিয়া সাহেবকে দেখলাম নির্বিকার। ইমরান যেসব বিষয়ে তার অভিযোগ প্রকাশ করছিল, মাওলানার অংশগ্রহণ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি আত্মমগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। ইমরানের অভিযোগের নমুনা কিছুটা তুলেই ধরি, সে বলল:

– আমরা কোনো কাজ করতে গেলে বুড়ো হুজুররা বাধা দেন। এমনকি ইবাদত বন্দেগি করলেও বাধা দেন।

– কীভাবে?

– ৫ তারিখের কয়েকদিন আগে। আমি আরো কয়েকজন তালিবে ইলম মিলে ঠিক করলাম, আমরা অবরোধ সফল হওয়ার জন্য প্রতিদিন ভোররাতে ওঠে তাহাজ্জুদ পড়ব। দিনে রোজা রাখব। এবং অন্যদেরকেও ঘুম থেকে তুলে দেব। কিন্তু আমরা এটা প্রথম দিন করার পর, আমাকে দফতরে ডেকে নিয়ে বিচার করা হলো। কেন? আমরা তো ভালো কাজ করেছি? তারপরও বাধা কেন?

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম:

– তোমার মূল কাজ কি বর্তমানে?

– পড়ালেখা।

– এই পড়ালেখার জন্য কখনো এভাবে অন্যদেরকে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েছ?

– জি না

– তোমার কী মনে হয়, তুমি যদি লেখাপড়ার জন্য এভাবে সংঘবদ্ধভাবে প্রয়াস চালাতে, তখনও কি হুজুররা বাধা সৃষ্টি করতেন?

– মনে হয় না।

– তুমি যে তালিবে ইলমদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিয়েছ, প্রতিদিন যে সময়ে জাগে তার কতক্ষণ আগে?

– প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে।

– এইযে ওদের সবার, অন্যদিনের তুলনায় এক ঘণ্টা কম ঘুম হলো, এতে দিনে কোনো প্রভাব পড়েনি?

– জি পড়েছে। সারাদিন সবার মাঝে ঘুম ঘুম ভাব ছিল, ফাঁক পেলেই একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে।

– এই যে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব নিয়ে ছিল, পড়ালেখায় মনোযোগ ছিল?

– জি না, ছিল না।

– আর রোজা রেখেছিলে যে সেহেরি কোথায় পেয়েছিলে?

– বাহির থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম।

– ফজরের পরে অন্যরা যখন পড়ছিল তখন তোমরা কী করেছ?

– আমরা ঘুমুনোর চেষ্টা করেছি।

– সারাদিন তোমাদের লেখাপড়ার মেহনত অন্যদিনের মতো ছিল? জোহরের পরে তোমাদের লেখাপড়ায় মন ছিল?

– জি না।

– সন্ধ্যায় ইফতারি করে মাগরিবের জামাত পেয়েছিলে?

– জি না, আমরা নিজেরা জামাত করেছি।

– এই যে ব্যতিক্রমগুলো হলো, এগুলো কি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটায়নি?

– জি।

– সবাই যদি এভাবে, মাদরাসায় নিয়মিত নিয়মের বাইরে ইবাদত- বন্দেগি করতে শুরু করে দেয়, শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে?

– জি না। থাকবে না।

– তোমার কী মনে হয়, তুমি যদি এককভাবে কাউকে না জানিয়ে তাহাজ্জুদ পড়তে, রোজা রাখতে, তাহলেও কি হুজুররা তোমাকে বাধা দিতেন?

– জি না, মনে হয় বাধা দিতেন না।

– কিন্তু আমাদেরকে তো সমাজের খোঁজখবর রাখতে হবে। দেশ-বিদেশের খবরাখবর রাখতে হবে। সেজন্য পত্র-পত্রিকা পড়তে হবে। যাতে আমরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ি। অনেক হুজুর আছেন, পত্রিকা পড়লেও কঠিনভাবে বকাবকি করেন।

– তুমি কি প্রতিদিনই পত্রিকা পড়?

– জি, প্রায় প্রতিদিনই পড়ি।

– কেন পড়?

– খবরাখবর জানার জন্য।

– খুব খেয়াল করে বল দেখি, তোমার সাথে যারা পত্রিকা পড়ে, তারা প্রথমেই কোন পৃষ্ঠাটা হাতে নেয়?

– খেলার পৃষ্ঠা।

– এবার তুমিই বিবেচনা করে দেখ, যদি অবাধে পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াতো। দেখো, আমাকে আবার ভুল

বুঝো না। আমি পত্রিকা পড়ার বিরোধী নই। আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাচ্ছিলাম যে, প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের পেছনে সবসময় সামগ্রিক কল্যাণ-চিন্তা কাজ করে, যা তুমি ব্যক্তিগত দৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ভুল মনে হবে।

আমাদের গাড়ি দ্রুতবেগে চলছিল। এতক্ষণ তো ঢাকা-চট্টগ্রাম বিশ্বরোডে ছিলাম। সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। সকালের দিকে ট্রাকের চলাচলটাই বেশি থাকে। রাস্তাটা অত্যন্ত বিপদজ্জনক থাকে। ট্রাক চালকরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ট্রাক চালায়। সারারাত এক নাগাড়ে গাড়ি চালিয়ে তারা কিছুটা ক্লান্তও থাকে।

কিন্তু এখন আমরা বিশ্বরোড থেকে লালমাই-বাগমারা হয়ে লাকসামের দিকে। এই পথে অতটা ভীড়বাট্টা নেই। গাড়িঘোড়ার আনাগোনাও অনেক কম। আবার একদম শূন্যরাস্তাও নয়। সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে নোয়াখালি থেকে ছেড়ে আসা দু,একটা বাস হুসহাস করে পাশ কাটাচ্ছিল।

অনেক অনেক আগে, সেই যখন হেফজখানায় পড়ি, তখন একবার এই পথে এসেছিলাম। বড় সুন্দর ছিল সেই ভ্রমণ। বড় আনন্দের ছিল সেই পরিভ্রমণ। কিছুক্ষণের জন্য কথা বন্ধ রেখে গা এলিয়ে দিলাম। হেফযখানায় কাটানো জীবনের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল জীবনের কথা ভাবতে লাগলাম।

মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সাথেও টুকটাক কথা হলো। আমাদের শহীদ মুজাহিদের সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলাম। তিনি খুব গর্বের সাথে শহীদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.)- এর কথা বলতে লাগলেন। পরিবারে, আত্মীয়ের মধ্যে একজন শহীদ থাকা আসলেই তো গর্বের। একজন শহীদের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তো অনেককেই নাজাত দিয়ে দেবেন। অনেক পাপীকে ক্ষমা করে দেবেন। তাই তো, এই যে আমরা শহীদ মাওলানার ইয়াতীম সন্তানদের দেখতে যাচ্ছি, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না? আমল দিয়ে তো সেদিন পার পাওয়া যাবে না। কোনো উসীলায় যদি আল্লাহর রহমতের সাগরে ঢেউ তুলতে পারি, তাহলেই হয়েছে।

★★★★

যেতে যেতে যেতে : ৪

আমরা লাকসামের পথে ছুটে চলছি। সূর্য আস্তে আস্তে উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত। ধান পাকতে শুরু করেছে। হলুদ ছোপ ফুটে উঠছে। দু'য়েকটা জমির ধান কাটা শুরু হয়েছে। মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হচ্ছিল। আমরা কতদূর এসেছি খোঁজ নিচ্ছে।

গন্তব্যে পৌছলাম। আশেপাশের মানুষ আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরলো। সবার কৌতূহল, আমরা ঢাকা থেকে কেন এসেছি? আমরা আগে থেকে বলে রেখেছিলাম:

– আমাদের আগমনের সংবাদ কাউকে জানানো যাবে না। আমাদের জন্য কোনো খাবারের আয়োজন করা যাবে না।

তারপরও দেখলাম অনেকেই জেনে গেছেন। সবাই বেশ প্রতিযোগিতা করে মুসাফাহা করতে শুরু করে দিলো। ঘরে গিয়ে বসলাম। ভাঙাচোরা ঘর। উপরে টিনের ছানি। পাশে বাঁশের বেড়া। এটা হলো শহীদ মাওলানার শ্বশুর বাড়ি। নিজের বাড়ি তো প্রায় হাতছাড়া। ছেলে সন্তান ছয় জন। বড় মেয়েটার বয়েস হবে বারো কি তেরো।

আমরা একটা পালঙ্কের উপর বসে আছি। একে একে (শহীদ মরহুমের) পাঁচ জনের সাথেই দেখা হলো। সবাই ছোট ছোট। মা'সূম। মেয়েটা তখন মাদরাসায় ছিলো। তার সাথে দেখা হয়নি। আমার মনে প্রশ্নটা বারবার ধাক্কা দিচ্ছে:

- এদের কী হবে? এদের লেখাপড়া কেমন করে হবে? এদের জীবন-জীবিকা কীভাবে চলবে? জানি, এসবের দায়দায়িত্ব আল্লাহর। কিন্তু বান্দার মনে এসব প্রশ্ন আসতেই পারে। রজিব সাহেব হুযুর বড় ছেলেটার হাত দিয়ে, তাদের মায়ের কাছে কিছু টাকার হাদিয়া পাঠিয়ে দিলেন। আমরা বসে বসে কথাবার্তা বলছি। শহীদ মরহুমের খোঁজখবর নিচ্ছি। অনেকেই এসে আমাদের সাথে দেখা করে যাচ্ছেন।

এই শহীদ পরিবারে বসে আমার মনে পড়ল, সোনালি যুগের আরো দুই শহীদ পরিবারের কথা।

মুতার যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধের প্রথম সেনাপতি যায়েদ বিন হারেসা। তিনি কাফনের কাপড় পরে নিলেন। লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বসে বসে, উপস্থিত সাহাবীগণকে যুদ্ধের পুরো বিবরণ দিচ্ছিলেন। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) শহীদ হওয়ার পর রাসূল কেঁদে ফেললেন। পাশে বসা উসামা বিন যায়েদকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে আদর করে চুমো দিচ্ছিলেন, আর কাঁদছিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন:

- কী হয়েছে ইয়া রাসুলাল্লাহ? আপনি কাঁদছেন কেনো?

রাসূল বললেন:

- প্রিয় মানুষের বিচ্ছেদে কাঁদছি। (শাওকুল হাবীবি লিহাবিবিহী)।

- ময়দানে কি কিছু হয়েছে?

- যায়েদ শহীদ হয়ে গেছে।

একথা শুনে ছোট্ট উসামা রাসূলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো। রাসূলও কাঁদছিলেন, আর উসামার মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করছিলেন।

যায়েদ বিন হারেসার শাহাদাতের পর এগিয়ে এলেন জা'ফর বিন আবি তালিব। ঝান্ডা উঠিয়ে নিলেন। দুশমন এসে তার ডানহাত কেটে দিলো। তিনি ঈমানের নিশান বামহাতে জড়িয়ে ধরলেন। দুশমনরা তার বামহাতও কেটে দিল। তিনি এবার দুই বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা উঁচিয়ে ধরলেন। এবার দুশমন তার বুকে তরবারি চালিয়ে শহীদ করে দিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুটে এলেন এই শহীদের বাড়িতে। ঘরে ছোট ছোট চারটা সন্তান।

জা'ফরের স্ত্রী আসমা (রা.) বললেন:

- আমি বাচ্চাদের গোসল করিয়ে, মাথায় তেল লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন। তিনি এসেই জিজ্ঞেস করলেন:

- আমার ভাই জা'ফরের ছেলেরা কোথায়?

বাচ্চারা দৌড়ে গিয়ে রাসূলকে জড়িয়ে ধরলো। তাদেরকে কোলে বসিয়ে রাসূল আকুল হয়ে কাঁদছেন, আর তাদেরকে চুমু খাচ্ছেন।

আসমা (রা.) বললেন:

- রাসূলাল্লাহর এই অবস্থা দেখে আমার মনে ভয় ধরে গেলো। জানতে চাইলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিছু হয়েছে কি?
- মুতার ময়দানে জা'ফর শহীদ হয়ে গেছে।

একথা শোনার পর আসমা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। বড় বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে জানতে চাইলো
- এখন আমাদের আব্বু কে হবে?

রাসূল বললেন:
- আমিই তোমাদের পিতা।

আমরা শহীদ মাওলানার শ্বশুরকে বললাম:
- আমরা জুম'আর নামায ঢাকা গিয়ে পড়ার নিয়ত করেছি। পথে আবার আসাদের বাড়িতে দুপুরের খাবারের দাওয়াত আছে। আমরা দু'আ সেরেই রুখসত নিতে চাচ্ছি।

তিনি কিছু না বলে ওঠে গেলেন। আমাদের শত আপত্তি ঠেলে নাস্তা হাযির করলেন। বিশাল আয়োজন। একটি শোকাহত পরিবারে জন্য নাস্তার এত ব্যাপক আয়োজন করা বিস্ময়কর। আমাদের লজ্জা লাগছিলো।

খাবার শেষে মুনাজাত হলো। আমার সিয়াহ দিল। গুনাহের কারণে বড়ই শক্ত। মুনাজাতে সহজে কান্না আসে না। কিন্তু রজীব সাহেব হুযুর সেদিন এমন মর্মস্পর্শী মুনাজাত করলেন যে, একজন কাফেরেরও কান্না আসতো। আমার একপাশে বসা ছিলো ইমরান। আরেক পাশে শহীদ মরহুমের বড় ছেলেটা। সবার ছোট ছেলেটা ছিলো রজীব সাহেব হুযুরের কোলে।

ইমরান মুনাজাতে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। সে আবেগপ্রবণ মানুষ। আমার বামে একজন পরে বসেছিলেন শহীদ মরহুমের শ্বশুর। তিনি আকুল হয়ে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন:
- ও আল্লাহ! আমার বিধবা মেয়েটার কী হবে? ইয়া মালিক! আমার এই ছয়টা ছোট ছোট ভাই-বোনের কী হবে? আমি বৃদ্ধ, অসহায়। শিক্ষকতা করে আর কয় টাকাই বা পাই? মা'বুদ! আপনি ছাড়া যে এদের আর কেউ রইলো না!

নানাজানকে কাঁদতে দেখে মরহুমের বড় ছেলেটা হাত তুলে বারবার বলছিলো:

ও আব্বু! ও আব্বু !

আমার বুকটা কষ্টে ভেঙে খানখান হয়ে যেতে চাচ্ছিলো। দু'আর ইতি টানলাম এই বলে:

- আল্লাহ্ গো! আপনার কাছে বিচার রইলো, আমরা নাকি রঙ মেখে সেদিন শুয়ে ছিলাম। ইয়া কাহহার! আপনি জানেন, সেটা রঙ ছিলো না। সেটা ছিলো শাহাদাতের তপ্ত খুন। ইয়া মা'বুদ! এই তাজা খুন কি বৃথা যাবে?

দু'আ শেষে আমরা রুখসত নিলাম। ও বাড়ির ছোট-বড় সবাই আমাদেরকে বিদায় জানাতে রাস্তা পর্যন্ত এলো। মরহুমের বড় ছেলেটা রজীব সাহেব হুযুরের হাত ধরে আসছিলো। গাড়িতে ওঠার সময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো। হুযুর গাড়িতে ওঠার জন্য যখন হাতটা ছাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, তখন সে হুযুরকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। কী জানি, হয়তো হুযুরকে দেখে তার শহীদ পিতার কথাই মনে পড়ে গিয়েছিলো।

এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবার চোখেও অশ্রু বাঁধ মানছিলো না। আমি অদূরে দাঁড়িয়ে রাব্বে কারীমকে শুধালাম:

- ইয়া আরহামার রাহিমীন! এই কান্না তো অভিনয় নয়। এই বাঁধভাঙা কান্না তো মিথ্যে নয়! আমরা না হয় শরীরে মিথ্যা রঙ মেখে শুয়ে ছিলাম(?), কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশুর চোখের পানি কি মিথ্যা হতে পারে?

(আলহামদুলিল্লাহ! আপাতত এখানেই শেষ)

FATEH24
তোমার ঘৃণার কাছে
আজ পরাজিত রক্ত নামের যে স্রোতেলা ক্রোধ
জেনে রেখো, রক্তঋণী এই পাথর থেকেই
একদিন জন্ম নেবে
আমার রক্তশোধের চারাগাছ
-সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর
৫ই মে